ভারতের
কারাগারে
দিনগুলো
ইফতিখার গিলানি
রূপান্তর
বিনতে আফজাল

ইফতিখার গিলানি ছিলেন কাশ্মীর টাইমসের নয়াদিল্লি ব্যুরো চীফ। এছাড়াও তিনি ডয়চে ভেলে, দ্য ফ্রাইডে টাইমস, দ্য ন্যাশন ও ডিএনএ ইন্ডিয়ায় কাজ করতেন। তার আরেকটি পরিচয় হলো তিনি কাশ্মীরের হুরিয়াত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জামাতা। পুলিশের স্পেশাল ফোর্স, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো ও ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট একযোগে তার বাড়িতে অভিযান চালায়। অভিযানে কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত একটি বাতিল কাগজ পাওয়া যায় যা পূর্বে বহুল প্রচারিত একটি বিবরণীগ্রন্থে প্রকাশ হয়েছিল। এই কাগজ রাখার অভিযোগে গিলানিকে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের অধীনে গ্রেফতার করে তিহার জেলে পাঠানো হয়।

কারাগারে অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় গিলানির ওপর। গ্রেফতারের পর থেকেই সোচ্চার মানবাধিকার কর্মী ও সাংবাদিকদের দাবির মুখে অবশেষে সাত মাস পর মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে।

গিলানির ওপর গোপন স্পাই ওয়্যার পেগাসাস দিয়ে নজরদারি চালানো হয়েছিল ২০১৭-২০১৯ সাল পর্যন্ত। এরপর তিনি তার পূর্বের ফোন ব্যবহার করা বাদ দিয়ে তুরস্কে গমন করেন ও বর্তমানে তুরস্কভিত্তিক গণমাধ্যম আনাদোলু এজেন্সিতে কাজ করছেন।

উৎসর্গ

তাদের জন্য, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে জীবন এবং স্বাধীনতা—সমাজ, রাষ্ট্র বা সংবিধান প্রদত্ত উপহার নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। স্বাধীনতার অগ্নিশিখা ততদিন পর্যন্ত জ্বলবে যতদিন এমন মানুষ আছে যারা তাদের সাহস, দৃঢ়তা আর দূরদর্শিতা দিয়ে ঐসব ব্যাপারগুলোকে প্রকাশ এবং প্রতিহত করে যেগুলো সুবিধার নামে স্বাধীনতাকে কুড়ে কুড়ে খায়।

সূচিপত্র

- ভূমিকা ৭
- স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার ১৪
- তারা আমার খোঁজে এসেছিল ২০
- ধোঁয়া ও আয়নাগুলো ৩৪
- তিহারের জীবন ৫০
- মোচড় এবং বাঁক ১০৩
- মিডিয়ার ভূমিকা ১২৫
- আইন ও তার অপব্যবহার ১৩৯

ভূমিকা

এরপর যদি একজন মন্ত্রী বা রাজনীতিবিদ, একজন পুলিশ বা সৈনিক, একজন আমলা বা বিচারক এমনকি একজন সাংবাদিক যদি বলে যে, সে আইনের শাসনকে গ্রাহ্য করে তবে আমি দুটি শব্দ উচ্চারণ করব; ইফতিখার গিলানি।

যে বেদনাদায়ক গল্প এ বইতে রয়েছে তা শুধু ক্ষমতার খামখেয়ালিপনা আর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ নয়, নয় ভারতীয় রাষ্ট্রের নিছক অনৈতিকতার ভয়ঙ্কর উপাখ্যান। কীভাবে সমাজের তথাকথিত স্তম্ভগুলো—চতুর্থ স্তম্ভের[১] সাথে একজোট হয়ে সুস্পষ্ট অবিচার নিয়ে আসে তার একটি হতাশাজনক চিত্র।

সাত মাসের জন্য, ইফতিখার—জম্মুভিত্তিক দৈনিক কাশ্মীর টাইমস এর দিল্লিস্থ দপ্তরের প্রধান এবং রাজধানীর একজন সম্মানিত সাংবাদিক যিনি ব্যাপকভাবে অপব্যবহৃত অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট (ওসএ) নামক কঠোর আইনের আওতায় জামিনবিহীন বন্দি ছিলেন।

তার অপরাধ ছিল ভারত শাসিত কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত বাতিল তথ্য রাখা যেটা তিনি সংগ্রহ করেছিলেন একটি পাকিস্তানি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বহুল প্রচারিত বিবরণীগ্রন্থ থেকে।

এখানে এসে বেশিরভাগ পাঠক ভাববেন আমি এখানে কোনো ভুল করেছি। কেন ভারতীয় সরকার এমন কাউকে বন্দি করতে ওএসএকে প্ররোচিত করবে যার কাছে পাকিস্তানের বাতিল করে দেয়া তথ্য আছে? উত্তর হচ্ছে: আমরা সত্যিই জানি না কেন? তাহলে কি অভিযোগ দায়েরকারী ইনটেলিজেন্স কর্মকর্তারা বোকা ছিল? হতে পারে। তারা কি ইফতিখারের গায়ে কোন অপরাধ গাঁথতে চাইছিল, কতটা হাস্যকর তা জেনেও? হতে পারে। তারা কি এটা ভেবে আত্মবিশ্বাসী ছিল যে একটা ভয়ঙ্কর প্রতারককে দূরে সরিয়ে দিতে পারবে? প্রায় নিশ্চিতভাবেই, কারণ তারা জানত যে রাষ্ট্রের সকল শাখার কর্মী ও কর্মকর্তারা

---

১. সংবাদপত্র হচ্ছে সমাজের চতুর্থ স্তম্ভ।

তাদের এ কাজে সহায়তা করবে এবং এটাও জানত যে তাদের উপরওয়ালারারা—যাদের আদেশ সম্ভবত তারা মেনে চলছে তারা কখনোই এই বিদ্বেষপরায়ণ কাজ করাতে তাদের বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা নিতে দেবে না।

তার পেছনে লাগা নীচ লোকদের নীচ হিসেব যাইহোক না কেন, এই বইয়ের ঘটনার বিবরণী থেকে আমরা এখন জেনে গেছি যে সাত মাসের ভেতর তিহার কারাগারে যখন ইফতিখারের স্বাস্থ্য ভেঙে যাচ্ছিল তৎকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী জানতেন যে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্দোষ। তবুও, এই দেশের 'জাতীয় নিরাপত্তা' রক্ষায় নিয়োজিত থাকা রাজনীতিবিদ আর কর্মকর্তারা তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে গরাদের পেছনে রাখার চেষ্টায় ছিল।

৯ জুন ২০০২ এ জিম্মায় নেবার পর ইফতিখার অবশেষে ১৩ জানুয়ারি ২০০৩—এ মুক্ত হন, তার বিরুদ্ধে করা অসংলগ্নতা আর বৈপরীত্যে ভরপুর মামলাটি যখন নিজের ভার নিজেই বইতে পারছিল না। এমনকি এটাও হয়তো ঘটত না কিন্তু ঘটেছে একদল দক্ষ ও অটল সাংবাদিকের কল্যাণে যারা ইফতিখারের মামলাটি লড়েছিল, তীক্ষ্ণভাবে তথ্য জোগাড় করে যেগুলো পরবর্তীতে চালিয়ে যাওয়া মামলা উচ্ছেদে সহায়তা করেছিল, এবং নিয়মিত বিরতিতে মন্ত্রী ও সম্পাদকদের ক্রমাগত জ্বালাতন করে, ক্রমাগত আবেদন দাখিল করে তার কারাভোগের কলঙ্ক ও দুর্ব্যবহারের বিষয়টিকে চলমান সমস্যা বানিয়ে রেখেছিল।

ইফতিখার এখন একজন মুক্ত মানুষ কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তার গ্রেফতার ও কারাভোগে বাধ্য করার পেছনের কারণগুলো এখনও চিহ্নিত হয়নি। সব কিছু ছাপিয়ে, তার মামলা সরকারের 'জাতীয় নিরাপত্তা' যন্ত্রের আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে প্রকাশ করে একজন নির্দোষ নাগরিক তৈরি করেছে। ওই ক্ষমতাগুলো রয়ে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওএসএ যথেষ্ট খারাপ, কিন্তু কেউ যদি এটা বিবেচনা করে যে, যেই নিয়ম ইফতিখারকে এর ভেতর নিয়ে এসেছে তারও একটা ব্যবস্থা আছে প্রিভেনশন অব টেরোরিজম অ্যাক্ট হিসেবে (অথবা এর নতুন অবতার দ্য আনলফুল এ্যাকটিভিটিস প্রিভেনশন অ্যাক্ট হিসেবে), অপব্যবহারের সম্ভাবনা প্রায় সীমাহীন।

এখন আমরা জানি যে ইফতিখারকে গ্রেফতারের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত তার কম্পিউটারে ভাগ্যক্রমে পাওয়া সন্দেহ জাগানিয়া ফাইলের কারণে নেয়া হয়নি। আইবি কর্মকর্তা তার হার্ড ড্রাইভ ঘেটে 'ভারত শাসিত কাশ্মীরে ভারতীয় বাহিনীর তথ্য' শিরোনামে ফাইল পায়। ভারত-শাসিত কাশ্মীর এই পাকিস্তানি শব্দটি জম্মু ও কাশ্মীরের যে অংশটি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে নেই সে অংশগুলোকে বোঝায়। জম্মু এবং কাশ্মীর শব্দ দুটি দ্বারা বোঝায় যে এগুলো নেয়া হয়েছে ভারতীয় দাপ্তরিক দলিল থেকে। এর গোপনীয়তার মাত্রা বোঝানোর জন্য তারা আরও যোগ করেছে, 'শুধু উল্লেখ করার জন্য, প্রচার বা প্রকাশ কঠোরভাবে নিষেধ।'

প্রথম ভুলটা ছিল এটাই, যখন আইবি কর্মকর্তারা মনগড়া সাক্ষ্য বানাল। কিন্তু বেরিয়ে আসার মতো আরও অনেক কিছু ছিল। মিলিটারি ইনটেলিজেন্স এর ডিরেক্টরেট জেনারেল (ডিজিএমআই)-কে যখন আইবির পাওয়া সাক্ষ্যের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে বলা হলো, তারা নিজেরাই এর রায় প্রকাশে অনীহা জানাল। যেহেতু এই ফাইলের একটি আসল পাকিস্তানি ফটোকপি বিবরণ তাদের দেয়া হয়েছিল, তাই এটা অজানা থাকার কথা না যে সেখানে কোন মামলা ছিল না আর ইফতিখার নির্দোষ। বস্তুত, যখন ছয় মাস পরে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য পুর্নমূল্যায়নের কথা বলা হয় তখন এটাই ছিল মূল্যবান মতামত। কিন্তু জুন মাসে, কিছু কারণে যেগুলো প্রমাণ হওয়া দরকার, ডিজিএমআই আর তার লোকেরা এমন মতামত প্রকাশ করার পক্ষপাতী হয় (পুনরুদ্ধারকৃত তথ্য সরাসারি 'আমাদের বিরোধীতার জন্য দরকারি' হতে পারত) যা মিথ্যা হবে বলেই তারা জানতেন।

যেহেতু প্রকাশিত দলিলে ডিজিএমআইয়ের 'মতামত'-এর কোন উল্লেখ ছিল না, ইফতিখারের আইনজীবীরা বৃথা চেষ্টা চালাল যেন কোর্ট এর বিচারাধিকার নেয় এবং দাবি করল যেন মিলিটারি তাৎক্ষণিকভাবে তার দ্বিতীয় মতামত দেয়। এখানে এসে মামলাটির তৃতীয় ও চতুর্থবারের মতো গতিরোধ হয়, যা ছিল আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় নিরাপত্তা ও সরকারি গোপনীয়তা রক্ষায় মিডিয়া ও নিম্ন বিচারব্যবস্থার জঘন্য রূপ। বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে শুনানি চলাকালে যারা ভুল বিবরণী ও ভুল বিবৃতির দ্বারা ন্যায় বিচারের প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করতে চেয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে কোর্ট তৎপরতার সাথে অবমাননাকর আচরণ দেখালেও, উদ্বিগ্ন বিচারক একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ

বানোয়াট সংবাদ প্রতিবেদনের, যেটা ইফতিখারকে প্রথমবার কোর্টে উত্থাপনের সময় প্রকাশিত হয়েছিল, সেটার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। যেখানে ছিল— সোমবারের শুনানির সময় গিলানি প্রতিবেদন অনুযায়ী বলেছেন যে তিনি আইএসআই-তে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েনের ব্যাপারে শ্রেণীবদ্ধ তথ্য পেয়েছেন। যখন প্রধান মহানগর বিচারক সংগীতা সেহগাল জানতে চান যে তিনি তার বিবৃতি রেকর্ড করবেন কিনা, গিলানি সম্মতিসূচক মাথা নাড়েন।

খবরটি ছিল মিথ্যা এবং আদালত অবমাননার সামিল। তবুও, কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

দিল্লি পুলিশ স্পেশাল সেলের এই বিবরণ যাকে খাওয়ানো হয়েছিল সেই অপরাধবিষয়ক পত্রিকার প্রতিবেদক কখনোই ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষমাপ্রার্থনা করেননি, যদিও সেই পত্রিকা পরে সংশোধন ও অস্বীকার করে। আমি ২০০৪ সালে এক কলিগের বিয়েতে ঘটনাক্রমে এই সাংবাদিককে প্রশ্নের মুখোমুখি করেছিলাম এবং আমি যখন বলেছিলাম যে তিনি ইফতিখার গিলানির ব্যাপারে যে চরম কাজটি করেছিলেন সেটা নিয়ে তার সাথে আমার বিতণ্ডা আছে, তিনি বলেছিলেন, 'আমি কোন ইফতিখার গিলানিকে চিনি না।' আমার খুব রাগ হয়েছিল কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নিলাম তাকে কিছু উপদেশ দেব—'যেসব পুলিশ আপনাকে দিয়ে তাদের গল্পগাথা প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারা তাদের সুনাম অক্ষত রাখতে পেরেছে। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনি যা করেছেন তা ততদিন পর্যন্ত আপনার সুনামে দাগ হয়ে থাকবে যদি আপনি ইফতিখারের কাছে মাফ না চান।'

নিতা শর্মার গল্পগাথা পুলিশের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটা ঠিক সে সময় প্রকাশ পায় যখন ইফতিখারের বন্ধু, অন্যান্য সাংবাদিক এবং আনুহিতা মজুমদারের খসড়াকৃত একটি আবেদন শক্তি যোগাচ্ছিল। ১০ জুন টাইমস অব ইন্ডিয়াতে প্রচারণা নিয়ে একটি ছোট প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো এবং পুলিশ ও আইবি দপ্তর তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করল যে কোনো ধরনের সাংবাদিক সংহতি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিতে হবে। সম্পাদকরা একমত হতো (এবং তারা হয়েছিলও) কিন্তু তাদের প্রচারণার পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক ছিল ইফতিখারের পুরোপুরি আইএসআই কর্মী হবার সাজানো স্বীকারোক্তি। শীঘ্রই, বাধের মুখ খুলে গেল এবং অনেক ভারতীয় মিডিয়ায় অসংখ্য বিদ্বেষভাজন প্রতিবেদন প্রকাশিত

হওয়া শুরু হলো ইফতিখারকে একজন বিশ্বাসঘাতক এবং জঙ্গি, চোরাচালানি এবং জিহাদি, একজন যৌনকাতর এবং 'সাংবাদিকের সুবিধা দাবি করা গুপ্তচর', বলে একসময়ের সাংবাদিক এবং ভারতীয় জনতা পার্টির এমপি বলবীর.কে. পুন্জের অপমানজনক ভাষায়।

কিন্তু সাংবাদিকরা যদি পেশাদারিত্বের পথ থেকে সরে যাওয়ার মতো ভুল করে থাকে তাদের ভুলটা ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমএইচএ) কর্মকর্তাদের চর্চার থেকে ছোট অপরাধ। যখন ২০০২ সালের ডিসেম্বরে ডিজিএমআই এর দ্বিতীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয়, যদি কোনো অপরাধ থেকে ইফতিখারকে অব্যাহতি দেয়াও হয়, এই মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যেকোন মূল্যে একজন নির্দোষ সাংবাদিককে কারাগারে আটক রাখার 'জাতীয়' দায়িত্ব থেকে সরে আসবে না। ইউনিয়ন আইন মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সিনিয়র কর্মকর্তা এবং স্পেশাল সেক্রেটারি (জম্মু ও কাশ্মীর বিষয়ক) এ.কে. ভান্ডারির সভাপতিত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের সভায় ডিজিএমআই এর ঝামেলাপূর্ণ মতামতকে 'অপ্রাসঙ্গিক' বলে বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। যদিও মিলিটারি ইনটেলিজেন্স এখন স্বীকার করছে যে ইফতিখারের কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত তথ্য প্রণীত হয়েছে পাকিস্তানে, এমএইচএ ধারণা করছে যে একই ব্যক্তি 'দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর', ইফতিখারের বিচার হওয়া উচিত। বস্তুত, ৭ জানুয়ারি ২০০৩ সালে কোর্টে এই ছিল এমএইচএ এর অবস্থান।

এমএইচএ এর অবস্থান দেখে আমি সেদিন মন্ত্রণালয়ের একগিলানিরজন সিনিয়র কর্মকর্তার সাথে কথা বলি। মামলাটি নিরীক্ষণ করে তিনি বললেন, 'তোমরা বলছ একটি প্রকাশিত দলিল আছে? কিন্তু তোমরা ভুলে গেছ এটা পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছে।' আমি বললাম, তাহলে এটা কীভাবে বেআইনি হয়? যেকোনো ক্ষেত্রেই, দিল্লির প্রতিরক্ষা অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে এর একটা কপি থাকার কথা। 'তুমি নিশ্চিত?' তিনি পাল্টা আঘাত হানলেন। নিরুদ্যম আলোচনাটি শেষ হলো পরবর্তী সময়ে ইফতিখারের রাজদ্রোহমূলক দলিল সংগ্রহের আরও বিস্তারিত জানানোর অফিসিয়াল প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে। যাহোক, ওইদিন আসার আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শীতল অবস্থা সৃষ্টি করল। কোর্টে ডিজিএমআই এবং এমএইচএ—এর ভেতর চরম অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা

দেখে, কেউ একজন কোথা থেকে সিদ্ধান্ত নিল, বিচক্ষণতা বাহাদুরির চেয়ে ভালো। কোনোরকম ব্যাখ্যা বা ক্ষমাপ্রার্থনা ছাড়াই মামলা তুলে নেয়া হলো নীরবে 'প্রশাসনিক কারণ ও জনস্বার্থে'।

অদ্ভূতভাবে, আমি আগের অনুচ্ছেদে যার কথা উল্লেখ করেছি তার সাথে আমার কাজ শেষ হয়নি। ইফতিখারের মুক্তির পরদিন তিনি আমাকে ফোন করলেন আলোচনার একটা মতামত অংশের সমালোচনা জানানোর জন্য যেটা আমি লিখেছিলাম। 'তুমি কি জানো তিনি আরও অনেক কিছু করেছিলেন যেগুলো তোমার জানা নেই?' তিনি বললেন। 'যেমন?' আমি জানতে চাইলাম।' তুমি কি জানো যে তার পাঁচ থেকে ছ'টা পাকিস্তানি ভিসা আছে?' আলোচনার পরিষ্কারভাবে কোনো দিকে মোড় নিচ্ছিল না তাই আমরা পরে এ বিষয়ে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি ফোন রাখলাম, ড্রয়ার খুললাম এবং তিনটি পাকিস্তানি ভিসা গুনলাম। যদি ছয়টা ভিসা ইফতিখারকে সাত মাসের তিহার বাস করাতে পারে তাহলে আমার জন্য কয়মাস হতে পারে? ভাগ্যবশত, নাগরিক মুক্তির জন্য সেই কর্মকর্তা অবসর নিয়েছেন এবং এমএইচএ থেকে বেরিয়ে গেছেন। কম ভাগ্যবশত, তিনি এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান চালাতে সহায়তা করছেন।

একজন ভদ্র, নম্র মানুষ ইফতিখারকে অনেক কষ্ট এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছে এবং তার অক্ষত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি তার গল্প সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এখানে বলেছেন যা সাংবাদিক হিসেবে তার নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এখানে প্রচুর করুণ ও নোংরা হাস্যরস রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইফতিখার সাংবাদিক হিসেবে তার দক্ষতা দিয়ে তার নিজের মামলার তাৎপর্য ও বিশেষত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন আর আমাদের নিয়মের শিকারদের দুর্দশাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। যে গল্প তিনি এখানে বলেছেন তা শুধু তার নিজের গল্প নয়, সেসব দুর্ভাগাদেরও গল্প যারা ওএসএ এর অধীনে যেন তাসের মামলায় আটকে আছে। তাদের গল্প, যাদেরকে আমাদের কারাগারে অত্যাচার করা হয়েছে, মারা হয়েছে। তাদের গল্প, যারা কারাগারের ধর্ষকামী কর্মকর্তাদের অমানবিকতার স্বীকার।

ইফতিখার আমাকে বলেনি কিন্তু এটা আমার কাছে অগ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে যে, আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আলাদাভাবে দায়

নিতে হবে। ইফতিখার কর্তৃক নাম বলা আইবি কর্মকর্তা ছাড়াও আর কে জানত যে তার কম্পিউটারে দলিলটা ভেবেচিন্তে রাখা আছে? কেইবা প্রথমবার ডিজিএমআই-কে দলিলের ব্যাপারে ফালতু মতামত দেয়ার কথা বোঝাল। মিডিয়াতে মিথ্যা খবর কে ছড়াল? পরিষ্কারভাবে তৎকালীন বাজপেয়ী সরকারের এসব প্রশ্নের উত্তর জানার কোন আগ্রহ ছিল না এবং এটা নিঃসন্দেহ যে আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কতটা অপেশাদার এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে তার প্রকৃত স্বরূপ কোনো সরকারই চাইবে না প্রকাশ পাক। কিন্তু কোর্ট একটি ভিন্ন বিষয়। আমি আশা করব প্রত্যেক আসনধারী বিচারক এই বইটি পড়ুক। আমি সর্বোচ্চ কোর্টকে উৎসাহিত করতে চাই যেন এই মামলাটি তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খেয়ালে আনে এবং ক্রিমিনাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে নির্দেশ দেয় যাতে দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ আইনগত কার্যাবলী ছাড়া ভারতীয় প্যানাল কোডের প্রাসঙ্গিক নিয়মে মামলা চালিয়ে যায়। ইফতিখার প্রায় সাত মাস তিহার কারাগারে কাটিয়েছেন। আমি বাজি ধরতে চাই যে এক মাস বা দুই মাস কিংবা তারচেয়ে বেশিদিনের জন্য কোনো নিরপরাধ শিকারকে কারাগারে পাঠানোর আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা দ্বিতীয়বার ভাবে।

ওএসএ সম্বন্ধে বলা যায় এটা একটি ঔপনিবেশিক যুগের আইন। একটি গণতান্ত্রিক সমাজের আইন বইতে যার কোন জায়গা নেই, একে বাতিল বা বহুলাংশে সংশোধন করা দরকার যেন অপব্যবহারের আর কোনো সুযোগ না থাকে।

১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ
দ্য হিন্দুর সহকারী সম্পাদক।[২]

---

২. সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ বর্তমানে The Wire পত্রিকার সম্পাদক।

এক

স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার

১৩ জানুয়ারি ২০০৩, ছ'টা বাজে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে এটা স্বপ্ন নয়। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি সত্যি সত্যি আবারও মুক্ত হচ্ছি। মুক্ত হচ্ছি কারাগার থেকে, অভিযোগ থেকে এবং আশা করা যায় কলঙ্ক থেকে।

আমি মুক্তি পেতে যাচ্ছিলাম তিহারের তিন নাম্বার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে। আমাকে দেওধিতে নেয়া হলো যেখানে আমার মুক্তির সকল আনুষ্ঠানিকতা সারার পর একজন দারোয়ান যান্ত্রিকভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম?'

'ইফতিখার গিলানি'

'বাবার নাম? বয়স? শনাক্তকরণ চিহ্ন? সে বলে চলল, তার চেহারা অভিব্যক্তিহীন।

প্রধান শিক্ষকের অফিসে এক স্কুলবয়ের মতো আমি উত্তর দিয়ে গেলাম। কারাজীবনের সাত মাসের পর ভয় আর আনুগত্য আমার মাঝে সহজাতভাবে চলে এসেছে।

তার কাজ শেষ হবার পর তত্ত্বাবধায়ক আর.পি মীনা এবং তার সহকারী যারা প্রক্রিয়াটা দেখছিল আমাকে বিদায় জানাল।

আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসা হলো বাইরের পৃথিবী আর তিহার কারাগারের রহস্যের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল দরজা পর্যন্ত। আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতাম যে এই দরজা আদৌ কখনো আমার জন্য খুলবে কিনা। আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না এটা ঘটবে।

একটা ছোট দরজা আমাকে বাইরের পৃথিবীতে নিয়ে এল। দীর্ঘ সাত মাস ধরে আমি এ মুহূর্তটির স্বপ্ন দেখেছি। আমি একটা গভীর, কম্পিত শ্বাস নিলাম, এবং তারপর শেষবারের মতো ঘুরে কারাগারের দিকে তাকালাম। ছোট দরজাটি বন্ধ হয়ে গেছে। এক ভয়ঙ্কর অতীতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

যখন আমি মুক্তির সতেজ বাতাসের আস্বাদ নিচ্ছিলাম তখন কাউকে বলতে শুনলাম, 'এই অ্যাম্বুলেন্সে উঠুন, গিলানি।' অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

ব্যক্তিটি ছিলেন একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক। তার পাশে আরেকজন কর্মকর্তা ছিলেন। চালক তার জায়গায় ছিলেন আর ইঞ্জিন চলছিল। কী ঘটছে আমি তা বুঝে ওঠার আগেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির পেছন সিটে ওঠানো হলো, কর্মকর্তা দুজন আমার দুপাশে বসে চালককে যেতে বলল। এমন ব্যাবহারের জন্য আমার হাটুতে বেশ আঘাত লাগল। কিন্তু আমার ব্যাথা আমার ভয়ের তুলনায় কিছুই ছিল না যখন আমি দেখলাম অ্যাম্বুলেন্সটা বন্দিদের মুক্তির জন্য বানানো মূল দরজার দিকে যাচ্ছে না। শীত হলেও আমি ঘামতে শুরু করলাম। সব ধরনের ভয়ঙ্কর চিন্তা আমার মনে ঝড় তুলল। সম্ভবত আমার মুক্তি পরিপূর্ণ নয়। সম্ভবত আমাকে আবার কোনো অভিযোগে গ্রেফতার করা হতে পারে যেমনটা ঘটে থাকে কাশ্মীরের বহু রাজনৈতিক বন্দিদের ক্ষেত্রে যাদের বন্দিত্ব বাড়তে থাকে একের পর এক অজুহাতে। কী হবে যদি তারা আমাকে কোন ফেইক এনকাউন্টারে ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। আমার মুক্তির আশা দ্রুত মরে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি কারাগারের কর্মকর্তাদের এ কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস পাচ্ছিলাম না যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। মোট কথা তারা বন্দিদের প্রশ্নের উত্তর দিতে অভ্যস্ত নয়। তাদের কাজ শুধুমাত্র বন্দিদের আদেশ করা।

হঠাৎ করে একটা মারুতি আর সান্ট্রো গাড়ির উদয় হলো অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে। সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের একজন আতঙ্কিত হয়ে চালককে দ্রুত চালাবার নির্দেশ দিলো। পেছনের গাড়িগুলোও দ্রুত চলতে শুরু করল। তারা যে অ্যাম্বুলেন্সকে ধাওয়া করছে তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্স আরও দ্রুতগতিতে চলতে শুরু করলে আমার বুকের ভেতর ধুকপুকানি ভয়াবহভাবে বেড়ে গেল। সাথে সাথে আমার পেটের ভেতর খালি খালি লাগা শুরু হয়ে গেল। কারাগারের ভেতরের যে অসমান রাস্তাটায় আমাদের গাড়ি চলছিল সেটা মূলত বন্দিদের মৃতদেহ চুপি চুপি কবর দেয়া বা পোড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িগুলো কাছাকাছি চলে এসে অ্যাম্বুলেন্সকে ছাড়িয়ে গেল। মারুতির ভেতরের লোকটা অ্যাম্বুলেন্স থামানোর ইঙ্গিত করল। এইবার আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে আমার জন্য ভয়ানক কিছু অপেক্ষা করছে। আমার সন্দেহ অমূলক ছিল না। কারাগারের ভেতর অনেকবার আমাকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে আমার মুক্তি আসন্ন, আমার জামিন হয়ে যাবে আর শুনানির পরদিনই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। প্রতিবার আমি পেয়েছি বিচারের দীর্ঘসূত্রতা।

ডিরেক্টর জেনারেল (কারাগার) এর অফিসের সামনে অ্যাম্বুলেন্স থামল। ডিজির (কারাগার) ব্যক্তিগত সহকারী আমাদের দিকে হাত নাড়ল। সহকারী তত্ত্বাবধায়কদের একজন নামল এবং তার সাথে কথা বলল। সান্ট্রো গাড়ির দরজা খুলে গেল। আমার বন্ধু জাল খামবাট্টা আর উমাকান্ত লাখেরা গাড়ি থেকে নামল। যদি বলি আমি স্বস্তির একটা শ্বাস ফেললাম তাহলে কমই বলা হবে। অন্য সহকারী তত্ত্বাবধায়ক বাইরের সহকর্মীর সাথে যোগ দিলেন। তারা আমার দুই বন্ধুর পরিচয় নিশ্চিত হলেন আর তাদের সাথে থাকা কাগজপত্রের বিপরীতে নিজেদের প্রমাণ করলেন। তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি তাদের চিনি কিনা।

আমি হ্যাঁ বোধক উত্তর দিলাম। আমাকে অ্যাম্বুলেন্স থেকে নেমে সান্ট্রোতে উঠতে বলা হলো। ব্যক্তিগত সহকারীর গাড়ির পেছনে একটা সাজানো পথ ধরে আমাদের গাড়িটি বাইরের দুনিয়ায় বেরিয়ে এল। তিনি আমাদের কারাগারের বাইরে বিদায় জানালেন।

আমি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছিলাম। জানতাম না ব্যাপারটা কেমন দেখাবে। সাত মাসের কারাবাস মনে হচ্ছে যেন একজীবন। আমার বাচ্চাদের চেহারা আমি প্রায় ভুলেই গেছি। মামলার হাজিরার সময়ে আমি শুধু আমার স্ত্রী আনিসার বিবর্ণ মুখখানি আর কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা মনে করতে পারতাম। এই অনুভূতিটা অভাবনীয়। আমি এখনও ভাবতে পারছি না যে আমি মুক্ত। আমার বন্ধুরা আমাকে আর আমার পরিবারকে একটা ছোট পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিল। পার্টি দিয়েছিল আমার আইনজীবী ভি.কে. ওহরি, লহরি উৎযাপন করার জন্য যেটার ঘটনাক্রমে সেদিনই পতন ঘটেছিল। পার্টিতে আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল। আমার বরং এর চেয়ে ভালো লাগত যদি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারতাম, আনন্দ ভাগাভাগি করতে পারতাম, আমার ভেঙে পড়া সত্ত্বাকে উজ্জীবিত করতে পারতাম আর আনন্দে চিৎকার করতে পারতাম যে আমি সত্যিই মুক্ত। বলতে পারতাম যে চরম পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কিছুদিন আগ পর্যন্তও সরকারের চোখে আমি ছিলাম একজন বিপজ্জনক পাকিস্তানি গুপ্তচর। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে সেনা গঠন ও নিরাপত্তা মোতায়েন বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের। আসলে মিলিটারি ইনটেলিজেন্স আমার কম্পিউটার থেকে উদ্ধারকৃত কাগজপত্রে ‘এই কাজ করতে বিশেষভাবে

দায়িত্বপ্রাপ্ত' এই মর্মে একটা দলিল পেয়েছিল। তারা বলেছিল ওই দলিল ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে মোতায়েন করা আর্মি, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস ও প্যারা মিলিটারি ফোর্সের বিশদ ওড়বাট (অর্ডার অব ব্যাটল)। অতএব অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ১৯২৩ এর ৩ ও ৯ নাম্বার ধারা অনুযায়ী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা হলো যার ফলাফল হচ্ছে চৌদ্দ বছর হাজতবাস। এর পাশাপাশি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো যৌন বিকৃতির এবং পর্ণগ্রাফিতে উৎসাহদানের জন্য ইন্ডিয়ান প্যানাল কোডের ২৯২ ধারা মোতাবেক অভিযোগ গঠন করা হলো।

আমাকে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সাত মাস ধরে চলে জবানবন্দি, মুলতুবি আর জামিনের মিথ্যে আশ্বাস। আমার বিরুদ্ধে সরকার অভিযোগ উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (CMM) এর কোর্টে আবেদন জানিয়েছে এই খবরটা প্রথম ঘোষিত হয় বিবিসি এর উর্দু সার্ভিস থেকে। ১০ জানুয়ারি ২০০৩ এর নীরস সন্ধ্যায়, ১১ নাম্বার ব্যারাকের ৫ নাম্বার ওয়ার্ডে বন্দিজীবনে কারাগার থেকে কেনা একটি ওয়ানব্যান্ড রেডিও আমার আসন্ন মুক্তির আনন্দদায়ক খবরটি বয়ে নিয়ে আসে। আমার সহচর বন্দি অরবিন্দ, অনীল এবং অতিশাম আমাকে আনন্দঅশ্রু নিয়ে জড়িয়ে ধরে। আমার মনের ভেতর আনন্দ উপচে পড়ছিল কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করে রাখি। সত্যি বলতে আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি।

আমার সহচর বন্দিরা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারা আমার আবেগের কমতির কারণ বুঝছিল না। মানুষ সাধারণত ভেঙে পড়ে, আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে, পাগলের মতো হাসতে থাকে, বা নাচতে থাকে যখন কারাগারের পাবলিক এড্রেস সিস্টেমে তাদের মুক্তির ঘোষণা দেয়া হয়। অবশেষে, আমার সহচর বন্দি গগণরাম সিং জানতে চাইল, 'কী হয়েছে ইফতিখার? তুমি কি খবরটা বিশ্বাস করোনি?'

আমি জানতাম না ওকে কী বলা যায়। সম্ভবত আমি ড. ভিক্টর ফ্রাঙ্কেলের এর বেস্টসেলিং বই 'ম্যান'স সার্চিং ফর মিনিং' এ বর্ণিত 'ডিপারসোনালাইযড' হয়ে গেছি। তিনি একজন বিখ্যাত ইউরোপীয়ান মনোবিদ যিনি নাৎসি গণহত্যার একটি ক্যাম্পে কয়েক বছর ছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মানসিকভাবে, মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের ক্ষেত্রে যা ঘটে তা হলো 'ডিপারসোনালাইযড'। সবকিছু যেন স্বপ্নের মাঝে ঘটছে, অবাস্তব, অসম্ভব। আমরা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এটা সত্যি।

শেষ বছরগুলোতে কতবার যে আমরা এমন স্বপ্ন দ্বারা প্রতারিত হয়েছি! আমরা স্বপ্ন দেখতাম যে মুক্তির দিন চলে এসেছে, আমাদের মুক্তি দেয়া হয়েছে, আমরা বাড়ি ফিরে গেছি, বন্ধুদের সাথে দেখা করেছি, স্ত্রীদের জড়িয়ে ধরেছি, টেবিলে বসেছি, আর আমাদের সাথে যা ঘটেছে সব বলতে শুরু করেছি—এমনকি কেমন করে আমরা আমাদের স্বপ্নে মুক্তির দিনটাকে দেখতাম তাও। আর তারপর আমাদের কানে তীক্ষ্ণ বাঁশির শব্দ বেজে উঠত, উঠে পড়ার সংকেত হিসেবে আর আমাদের মুক্তির স্বপ্ন ভেঙে যেত। আর এখন স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। আমাদের কি এতে বিশ্বাস হয়?'

তিহার কারাগারে থাকাকালীন সময়ে অসংখ্যবার আমার স্ত্রী এবং বন্ধুরা আমাকে বলেছে যে আমি খুব তাড়াতাড়িই মুক্তি পাব, কিন্তু কিছুই ঘটেনি। তাই আমি আমার মুক্তির কথা ভাবা বাদ দিয়েছিলাম। আমি অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট এর আওতায় অনেক মানুষকে দীর্ঘ সময় ভুগতে দেখেছি। মামলা আমার বিরুদ্ধে যা করতে পারত ওদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আর তার পক্ষে আনা প্রমাণ তারচেয়েও তুচ্ছ ছিল। অনেক মানুষকে দেখেছি তুচ্ছ কারণে কারাগারে ধুকে মরতে। এমন অভিযোগ যেটা আমার কাছে গ্রেফতার এবং বন্দিদশার জন্য উপযুক্ত মনে হয়নি। আমার কাছে মনে হয়েছে আইন একটা জটিল সৃষ্টি আর যারা এ যন্ত্রটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারা যথেষ্ট কূটবুদ্ধিসম্পন্ন। তারা নিজেদের ধূর্ততা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাই আমি নিজের ব্যাপারে কঠোর হয়ে গেলাম আর একটা দীর্ঘ সময় কারাগারে থাকার ব্যাপারে নিজেকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিলাম।

পরের দুদিন ছিল গতানুগতিক শুধুমাত্র এই ব্যাতিক্রমটা ছাড়া যে আমার আসন্ন মুক্তির খবরটা আমাকে বন্দিদের মাঝে নায়ক বানিয়ে ফেলল। অনেকে আমার মধ্যে একজন ত্রাণকর্তা দেখেছিলেন। আর অনেকে দেখেছিলেন আশার আলো। আমি আক্ষরিক অর্থেই অভিনন্দন আর শুভকামনায় ডুবে ছিলাম। আমি কীভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারতাম? এক ধরনের ঘনিষ্ঠতা আর দায়িত্ববোধ আমাকে গ্রাস করল। আমি জানতাম অনেক বন্দি অপরাধী কিন্তু বন্দিদের একটা বিরাট অংশ ওই ভয়ানক জায়গায় পড়ে আছে কোনো কারণ ছাড়াই। তাদের এই দুর্দশার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই শুধু এটাই ছিল তাদের ভাগ্য, একথা বলা ছাড়া। তাদের কেউ কারাগারের জীবনটাকেই আকড়ে ধরেছে,

কেউ চায় প্রতিশোধ নিতে, কেউ চায় সুবিচার, আর কেউ চায় বাইরে বেরিয়ে জীবনটাকে নতুন করে সাজাতে। প্রত্যেক বন্দির বলার মতো নিজস্ব একটা গল্প আছে। যাদের জীবনটা ছিন্ন-বিছিন্ন হয়ে গেছে, যাদের পরিবারগুলো বিদ্বেষীদের দ্বারা নিঃস্ব হয়ে গেছে তারা প্রত্যেকে চায় আমি যেন তাদের গল্পগুলো বাইরের পৃথিবীকে জানাই। হয়তো কোন বিবেকবান কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতা তাদের দুর্দশা বুঝবে, তাদের জন্য কিছু করবে। আমি জানি না আমি কীভাবে তাদের এই আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করব।

ইতিমধ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়া খবর প্রকাশ করে ফেলেছে যে সরকার আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ উঠিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অনেকে আমাকে ভুল করে এস.এ.আর গিলানি ভেবেছেন যিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, সংসদ ভবন আক্রমণের অভিযোগে আটক আছেন। তারা অসন্তুষ্ট ছিল এ কারণে যে সরকার এমন কাউকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে যাকে কোর্ট মাত্র কিছুদিন আগে দোষী সাব্যস্ত করেছে। আমি তাদের কী করে বোঝাই যে আমি শুধু একজন নির্দোষ সাংবাদিক। আমি শুধু নিজের কাজ করছিলাম আর আমি কোনো কঠিন গুপ্তচর নই। তারা কি আমাকে বিশ্বাস করবে?

দুই

তারা আমার খোঁজে এসেছিল

কারাগার থেকে আমার মুক্তিটা যেমন ছিল অপ্রত্যাশিত আর নাটকীয়তায় ভরা তেমনি ছিল আমার গ্রেফতার, বিচারের জন্য রিমান্ডে নেয়া আর তারপর পুলিশী হেফাজতে নেয়া। শুরুটা ছিল ৯ জুন, ২০০২—এ।

আমার কাজের দিনগুলো ছিল ব্যাস্ততায় ভরা যে কারণে বিগত চার সপ্তাহ ধরে আমি রবিবারগুলোতে ছুটি কাটাতে পারিনি। এমনকি আগের রাতেও আমি ১টা পর্যন্ত কাজ করেছি। ফ্রাইডে টাইমস, লাহোর এর জন্য আমার সাপ্তাহিক কলাম তৈরি করছিলাম। পরদিন সারা সকাল ঘুমানোর ইচ্ছা ছিল। আমার স্ত্রী ঘুমজড়ানো স্বরে কাশ্মীরি ভাষায় আমাকে বলল, 'দরজায় কে যেন এসেছে।'

আমার উত্তর দেবার আগেই আরো জোড়ে দরজায় কড়া নাড়া হলো।

আমি বাতি জ্বালালাম।

ভোর ৪:৩০ বাজে।

আমরা কি কল্পনাই করলাম কিনা যেহেতু ডোরবেল বাজেনি, নাকি ওখানে কেউ নেইই, ভাবতে ভাবতে টলতে টলতে সামনের দরজার দিকে গেলাম। দরজায় পৌছেই গলার স্বর পেলাম।

'মনে হচ্ছে এরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।'

আধো-জাগরণে আমি দরজা খুললাম।

সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) এর দুজন এসএলআর বহনকারী পুলিশ হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল, তাদের বন্দুক আমার উপর উদ্যত। দশ থেকে বারোজন বাইরে দাড়িয়ে।

সবকিছু এত দ্রুত ঘটে গেল যে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন ব্যক্তি এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিল, 'আমি বিক্রম সাহাই আয়কর বিভাগ থেকে এসেছি। আমার কাছে আপনার বাড়ি সার্চ করার অনুমোদন আছে।'

তিনি আমাকে একটি কাগজ দেখালেন, এতে উপরের দিকে আমার শ্বশুর সৈয়দ আলি শাহ গিলানিসহ আমার নাম, ঠিকানা লেখা আছে। তিনি আমাকে

স্বাক্ষর করতে বললেন। আমি জানতাম না কাগজে আর কী লেখা আছে কিন্তু অসাড়ভাবে স্বাক্ষর করলাম।

'যেহেতু আপনি আমার বাড়িতে ঢুকেই পড়েছেন, তাহলে বাড়ি সার্চ করতেই পারেন' আমি তাকে বললাম, আমি তখন পুরোপুরি সজাগ। 'এত আয়োজন কীসের? আমার দিকে বন্দুক তোলার কোন কারণ আছে কি? আপনার কি মনে হয় আমি একজন সন্ত্রাসী?' আমি সশস্ত্র সিআইএসএফ লোকটির দিকে নির্দেশ করলাম।

সাহাই পুলিশের লোকটিকে অস্ত্র নামাতে বললেন।

'আপনি বাড়ি সার্চ করুন কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে নিয়ে তামাশা করবেন না। আমাকে এ এলাকায় থাকতে হবে। আমার বাড়ির বাইরে এসব বন্দুকধারী নিরাপত্তা বাহিনীকে দেখলে আমার সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে সন্ত্রাসী বা অপরাধী ভাবতে পারে,' আমি আরও বললাম।

বিক্রম সাহাই সিঁড়ির গোড়ায় অপেক্ষমাণ তার বাহিনীকে, যার ভেতর একজন মহিলাও আছেন ভেতরে আসতে বললেন। তারা বাড়িতে ঢুকল এবং এত দ্রুতগতিতে যেন কোন কমান্ডো বাহিনী কোন সন্ত্রাসী আস্তানা খুজে পেয়েছে এমনভাবে প্রতিটি রুম দখলে নিল। আমার আধো-জাগরিত স্ত্রীর বেডরুমও বাদ গেল না।

দিল্লির অননুমোদিত কলোনিতে নীচতলার একটা ছোট ফ্ল্যাট আছে আমার। এতে দুটি শোবার ঘর, একটি স্টাডি কাম অফিস রুম, একটি রান্নাঘর, একটি বসার ঘর আর একটি লবি কাম ডাইনিং রুম আছে। বসার ঘর আর পড়ার ঘর দুটি দিয়ে কলোনিমুখী খোলা জায়গা দেখা যায়। লবিটা এ দুই রুম, শোবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝে। মূল দরজা দিয়ে লবিতে যাওয়া যায় আর একটা পার্শ্ব দরজা অতিথিদের বসার রুমে নিয়ে যায়, বাসার এ ধরনটা কাশ্মীরি ঐতিহ্যকে বহন করে।

হতভম্ব এবং বিস্ফোরিত আনিসা বসার রুমে আসার আগে তার রাত্রিবাস বদলাতে চাইল কিন্তু নিরাপত্তা কর্মী সে রুম ছেড়ে গেল না। তাই সে কাপড় নিয়ে বাথরুমে গেল। মহিলা অফিসারটি তাকে অনুসরণ করে গেল আর বাথরুমের দরজা আটকাতে নিষেধ করল। আমার স্ত্রীর গোপনীয়তা লঙ্ঘিত

হলো। আমি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে এর প্রতিবাদ করলাম কিন্তু কেউ কর্ণপাত করল না।

সাহাই জানতে চাইল আমার ফোন কোথায়। আমি তাকে স্টাডি কাম অফিস রুমে নিয়ে গেলাম। তিনি আমাকে রুম ছেড়ে যেতে বললেন আর ফোনটা নিয়ে নিলেন। আমি লবিতে চলে এলাম। প্রতিটি রুম সাহাই এর লোক দ্বারা ভর্তি। প্রায় বিশ মিনিট পর সাহাই বের হয়ে এলেন।

আমার স্ত্রী ভদ্রতা করে জানতে চাইলেন, 'আপনি চা খাবেন?'

'না, চায়ের কোন প্রয়োজন নেই-আমরা এখানে কাজে এসেছি,' তিনি উত্তর দিলেন।

তারপরও আনিসা তাদের সবার জন্য চা বানাল কিন্তু তারা কেউ চা স্পর্শ করল না। যাহোক তারা আমাদের চা খাবার অনুমতি দিল। এটাই ছিল পরবর্তী আট ঘন্টার জন্য আমাদের নাস্তা। জুনের ভ্যাপসা গরমে আমাদের এক ফোটা পানি খাবারও অনুমতি ছিল না। কিন্তু একথা তখন আমরা জানতাম না।

ফোনে কথা বলার পর সাহাই আমাকে বললেন আমার শ্বশুর দিল্লিতে এলে যে ফ্ল্যাটে থাকেন সেখানে নিয়ে যেতে। আমি ভাবলাম তারা এসেছে উনার বাড়ি ঘেরাও করতে আর পুরো ব্যাপারটা শুধুমাত্র উনার সাথেই সম্পর্কিত। জম্মু এবং কাশ্মীরের ভারতের সাথে সংযুক্তির প্রশ্নে তেইশটি রাজনৈতিক দলের সংহতিতে গঠিত অল পার্টিস হুরিয়াত কনফারেন্সের একজন প্রখ্যাত নেতা হওয়ার কারণে তাকে অতীতেও সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের কর্মকাণ্ডের মুখে পড়তে হয়েছে।

সৈয়দ আলি শাহ গিলানি সেসময় দিল্লিতে ছিলেন না। আমি নিকটস্থ একটা ভবনে অবস্থিত তার ছোট দুই রুমের ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে সাহাই এর সাথে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তায় নামতেই আমি দেখলাম এক বিশাল সশস্ত্র পুলিশবাহিনী যুদ্ধংদেহী অবস্থায় প্রস্তুত, তাদের অস্ত্রগুলো আমার বাসার দিকে তাক করা। আমি অবাক হয়ে গেলাম কারণ আমি ভেবেছিলাম যে পুরো বাহিনী আমার বাসায় আছে আর এ ব্যাপারটা হয়তোবা চুপচাপ থাকবে। তাদের উপস্থিতি পুরো এলাকায় ভয় ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আঘাতের চেয়ে আরও অনেক বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ফ্ল্যাটে পৌছে ভবনের বাইরে একটা বড় জমায়েত দেখতে পেলাম। ফ্ল্যাট ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে আর প্রায় বিশজনের মতো লোক ভিতরে বসে ছিল। তালা ভাঙা হয়নি। বোঝাই যাচ্ছিল তাদের কাছে চাবি ছিল। তারা আমাকে সেখানে থাকতে বলল আর তারা যা জানতে চাইবে তার উত্তর দিতে বলল।

'আমি এ জায়গা সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না কারণ আমি এখানে খুব একটা আসি না। আমার স্ত্রী হয়তো আপনাদের কিছু জানাতে পারবে যদি সে কিছু জেনে থাকে। যেহেতু সে শুধু তার বাবা এখানে থাকা অবস্থায়ই আসে,' আমি বললাম।

সাহাই আমাকে আমার বাসায় ফেরত নিয়ে গেল। তিনি আমাকে লবিতে বসতে বললেন আর স্টাডি কাম অফিস রুম বা বসার ঘরে আসতে নিষেধ করলেন। তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন উনার একজন লোকের সাথে তার বাবার বাসায় যেতে।

তখন সকাল ছ'টার মতো বাজে।

আমার স্ত্রী তার বাবার বাসায় গেল। অনুসন্ধান ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। পুরো জায়গাটা ওলটপালট করা হয়েছে।

আমি যখন সাহাই এর সাথে বাইরে ছিলাম তখন দলটি আমার বাসায় তাদের 'সার্চ অপারেশন' শুরু করে যদিও এর জন্য তন্ন তন্ন করে খোজা শব্দটিই বেশি মানানসই।

প্রায়ই কেউ না কেউ একটা কাগজের শীট বা একটা বই নিয়ে এসে আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আমি উত্তর দিতাম আর তারা আমার অফিস ঘরে বা বসার ঘরে ফিরে যেত। সকাল আটটার ভেতর পুরো জায়গাটার তল্লাশি প্রায় শেষ গেল শুধু বাকি রয়ে গেল শোবার ঘরের ওয়ারড্রব যার চাবি ছিল আনিসার কাছে। যখন তারা আনিসার ফেরার অপেক্ষায় ছিল তাদের একজন বাইরে গিয়ে তাদের দলটার জন্য সকালের নাস্তা নিয়ে এল।

তারা সবাই অফিস ঘর আর বসার ঘরে একত্রিত হয়ে নাস্তা খেল। আমি লবিতে বসে ভাবতে লাগলাম কখন তাদের কাজ শেষ হবে।

'ফ্রিজে কোন পানি আছে?' অভিযান দলের একজন রেফ্রিজারেটর খুলে জানতে চাইল।

'দেখুন যদি থেকে থাকে,' আমি নির্ভয়ে উত্তর দিলাম।

আমার ক্ষুধা লেগেছিল কিন্তু আনিসা তখনও তার বাবার বাসায় আর আমাদের রান্নাঘর বরং পুরো বাসা এই অনাহূত অতিথিদের নিয়ন্ত্রণে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে ঘন্টাখানেক আগে আনিসার দেয়া চা খাবার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া একই মানুষগুলোর আমার রান্নাঘর আর রেফ্রিজারেটর ব্যাবহার করার আগে আমার অনুমতি নেয়ার নূন্যতম ভদ্রতাটুকুও জানা নেই। আমি এদিকে আদবকায়দা আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবছিলাম অথচ জানতাম না আমার আর আমার পরিবারের জন্য কী অপেক্ষা করছে। সৌভাগ্যবশত, আমাদের চার আর আড়াই বছর বয়সী বাচ্চাদুটো তখন আমাদের সাথে ছিল না। তাদের উপস্থিতি আমাদের ভোগান্তি আরও বাড়িয়ে দিত।

আমার অফিসে তখন এই অপারেশন নিয়ে রুদ্ধশ্বাস আলোচনা চলছিল। কেউ কেউ বলছিল আপত্তিজনক কিছু যেহেতু পাওয়া যায়নি তাই কোনো ব্যবস্থা নেয়া যাবে না। অন্যরা যুক্তি দেখাচ্ছিল যে খবর যেহেতু ছড়িয়ে পড়েছে তাই আমার ব্যাপারে কিছু করা উচিত। এই সময়টাতেই আমি বুঝতে পারলাম যে তারা আমাকে নিয়ে পরিকল্পনা আঁটছে। এতক্ষণ যাবত আমি ভাবছিলাম যে তারা আমার শ্বশুরের ব্যাপারে কোনো তথ্য পেয়েছে আর সেটা নিয়েই কাজ করছে। সেখানে বসে এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটা আয়কর বিভাগের কোনো সাধারণ অভিযান নয়। আমি বিস্মিত হলাম যে আয়কর অভিযান আসল অভিযানকে কভার করছে যেটা পরিচালিত হচ্ছে ইনটেলিজেন্স ব্যুরো দ্বারা। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার কাজ হচ্ছে দেশের অভ্যন্তরে ইনটেলিজেন্স কার্যক্রম চালানো।

সকাল নয়টার অভিযান দলটির নাস্তা খাওয়া ও আলোচনায় শেষ হলো। তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পুরো জায়গাটা আবার তল্লাশি করা।

দলটি কাজে নেমে পড়ল। বিক্রম সাহাই লবিতে আমার সাথে বসলেন। 'আপনার গাড়ির চাবিটি আমাকে দিন,' তিনি বললেন।

আমি টেবিলে ফিরে গিয়ে আমার বাস পাসটি তাকে দিলাম।

তিনি কার্ডে নজর দিয়ে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

'আমার কোন গাড়ি নেই, আমি দিল্লি ট্রান্সপোর্টেশন কর্পোরেশন (ডিটিসি) এর বাসে যাতায়াত করি,' আমি বললাম।

তিনি বিশ্বাস করলেন না। তিনি তার একজন লোককে পাঠালেন প্রতিবেশীদের থেকে জেনে আসার জন্য। তারা নিশ্চিত করল যে আমার কোনো

গাড়ি নেই। তারপর আমার মোবাইল ফোন সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো। আমি বললাম আমার কোনো মোবাইল নেই। পরবর্তীতে আমার ইন্টারনেট একাউন্টের পাসওয়ার্ড চাইলেন, আমি সাথে সাথেই দিলাম।

এখন আমি যথাযথভাবে আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা এবং আইবি কর্মকর্তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছি। আয়কর বিভাগের কর্মকর্তাদের আচরণ স্পষ্টতই নম্র আর গোয়েন্দারা নিষ্ঠুর ও কর্কশ।

ঠিক সেসময় একজন লোক আমার অ্যাড্রেস বুক হাতে করে লবিতে নিয়ে এসে তার মধ্যে কলম দিয়ে দাগাতে শুরু করল। আমি তাকে অনুরোধ করলাম এরকম না করার জন্য।

'উনাকে বলুন,' পাশে দাড়িয়ে থাকা একজন কালোবর্ণের, চিকন লোককে দেখিয়ে সে উত্তর দিল।

'অফিসিয়াল কাজে বাধা দেবেন না,' লোকটি আমাকে সাবধান করল আর তাকে তার কাজ চালিয়ে যেতে বলল।

সাহাই আমাকে কম্পিউটার চালু করতে বলল। আমি চালু করলাম। তিনি সংরক্ষিত তথ্য স্ক্যান করতে শুরু করলেন। আধা ঘন্টা পর তিনি কম্পিউটার বন্ধ করলেন। তিনি কোন প্রিন্টআউট নেননি।

দ্রুত কিছু কর্মকর্তা অভিযানে যোগ দিলেন। তাদের সবাই ছিলেন আইবির লোক। আমাকে আইবির একজন কর্মকর্তা যার নাম ছিল মজিদ, আমি পরে জানতে পেরেছি, আবার কম্পিউটার চালু করতে বললেন। তিনি ছিলেন ফর্সা ও মধ্যম গঠনের একজন মানুষ। তিনি কম্পিউটার স্ক্যান করলেন আর আমাকে এর ভেতরের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রশ্ন করলেন। এর মধ্যে তিনি কিছু ফাইলের প্রিন্টআউট নিলেন। তিনি 'ফোর্সেস' লেখা একটা ফাইল দেখতে পেলেন। স্বভাবতই তিনি সেই ফাইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম এটা ইন্টারনেট থেকে নামানো হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড ম্যাটারিয়াল হিসেবে। তিনি এই ফাইলেরও একটা প্রিন্টআউট নিলেন।

এই সময়ে, কিছুদিন ধরে ঘটা কিছু ব্যাপার আমার মনে পড়তে শুরু করল যেগুলো আমাকে অবাক করছিল আর এখন তার মানে আমি বুঝতে পারলাম।

গত দুইদিন ধরে অর্থাৎ জুন ৭, ২০০২ তারিখ থেকে আমি কোনো ইমেইল পাচ্ছিলাম না। যেহেতু আমার ইমেইল ছিল কাশ্মীর টাইমস এর দিল্লি অফিসের

একটি অফিসিয়াল ইমেইল আর প্রতিদিন এটা প্রিন্টলাইনে আসত তাই আমি দৈনিক একশরও বেশি ইমেইল পেতাম। হ্যাঁ, আমার ইমেইল ব্লক হয়েছিল। আমি সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে অভিযোগ (বিএসএনএল) করেছিলাম যে আমার সংবাদগুলো গন্তব্যেও পৌছাচ্ছে না আবার ফিরতি হয়েও আসছে না। কিন্তু বিএসএনএল কোন সন্তোষজনক উত্তর দেয়নি।

আমি পরে আমার প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জেনেছিলাম যে সেই ভাগ্যনির্ধারিত সকালটির কয়েকদিন আগে একটি মারুতি গাড়ি তিন-চারজন লোকসহ আমার ফ্ল্যাটের কাছাকাছি সারাদিন পার্ক করা থাকত। একজন প্রতিবেশী তাদের পরিচয় পর্যন্ত জানতে চেয়েছিল। তারা দৃঢ়ভাবে উত্তর দিয়েছিল সে যেন নিজের কাজ নিজে করে কারণ তারা পুলিশের লোক।

সকাল ১০:৩০ এর দিকে অভিযান বাহিনীর ভেতর এক ধরনের আতঙ্ক দেখা দিল। আইবি এর আরও কয়েকজন গোয়েন্দা এতে যোগ দিল। তারা তাড়াতাড়ি করে কলোনির দিকের খোলা অংশের জানালার সব পর্দা টেনে দিতে শুরু করল। কি ঘটছে তা দেখার জন্য আমি স্টাডিতে গেলাম। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার ক্যামেরাম্যান দিয়ে এলাকা গিজগিজ করছে। এটা দেখে আমার অনুমান দৃঢ় হলো যে এই অভিযান সত্যি নয় বরং প্রচারণার উদ্দেশ্যে করা। যেহেতু ওখানে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলাম, একজন আইবি অফিসার স্টাডি রুম থেকে চিৎকার করে উঠলেন, 'ভেতরে ফিরে যান, এখানে আর আসবেন না।'

আমি লবিতে ফিরে গেলাম। স্টাডি আর বসার ঘর সারাদিন আমার আয়ত্তের বাইরে রইল। আমি নম্রভাবে সাহাই এর কাছে জানতে চাইলাম মিডিয়ার লোকজন এখানে আসার কারণ কী। তিনি সমান বিস্মিত হলেন এবং জানালেন যে তার বিভাগের কেউ মিডিয়ার কাউকে এই অভিযানের ব্যাপারে কিছু জানাননি।

যেটা আমাকে গত রাত বারোটার সময় আমার এক সাংবাদিক বন্ধুর আপাতদৃষ্টিতে নির্দোষ একটা ফোন কলের কথা মনে করিয়ে দিল, তখন আমি ফ্রাইডে টাইমস এর কলামের জন্য কাজ করছিলাম। তিনি ছিলেন প্রেস ট্রাস্ট ইন্ডিয়ার একজন সাংবাদিক এবং তিনি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন যে

আমার শ্বশুরের বাড়ি ঘেরাও করা হয়েছে কিনা। আমি বলেছিলাম আমার জানা নেই। কল কেটে যায় আর আমি বিষয়টা ভুলে যাই।

এখন আমার কাছে বিষয়টা পরিষ্কার যে কিছু সাংবাদিক ইঙ্গিত পেয়েছিল এমন খবরের যেটা নিয়ে তারা কাজ করতে পারবে। একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি জানি যে অতিউৎসাহী সংস্থাগুলো থেকে খবরের এমন 'পাচার' নিতান্তই স্বাভাবিক।

মিডিয়ার লোকজন আসার আগেই বেশিরভাগ সিআইএসএফ এর লোক এলাকা ত্যাগ করে চলে যায়। দুজন ছাড়া যারা এই সার্চ অপারেশন এ সাক্ষী হিসেবে ছিল। এই দুজন সারাদিন ছিল। এটা আমাকে অবাক করেছে যে অভিযান দল আমাদের মোটামুটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে কোনো সাক্ষী গ্রহণের চেষ্টা করেনি।

পাঁচ ঘন্টারও বেশি পেরিয়ে গেছে, আনিসা এখনও তার বাবার ফ্ল্যাট থেকে ফেরেনি। বিষয়টা আমাকে উদ্বিগ্ন করল। আমি সাহাইকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন যে তাকে নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই–সে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবে।

ওদিকে, আনিসাকে সাহায্য করতে হচ্ছিল অভিযান দলকে তার বাবার লিখিত উর্দু লেখা পাঠোদ্ধারে। তাকে চারপাশে ছড়িয়ে থাকা উর্দু বইও পড়তে বলা হচ্ছিল। আনিসার সাথে থাকা মহিলা অফিসারটি ছিল বেশ উদ্ধত। এবং আনিসা তাকে সহযোগিতা না করলে আটকে রাখার হুমকি দিচ্ছিল বারবার।

আনিসা তার বাবার ফ্ল্যাট থেকে ফিরে আসতে আসতে অনুসন্ধান শেষ হয়ে গিয়েছিল, আরও আইবি কর্মকর্তা চলে এসেছিল। বাসায় তারা এখন সংখ্যায় ষাট জনের বেশি তো হবেই। তারা আনিসাকে ওয়ারড্রবের চাবি দিতে বলল। তারা ইতিমধ্যে পুরো শোবার ঘর তছনছ করে ফেলেছে। স্যুটকেস খোলা পড়ে ছিল আর কাপড়, কাগজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। ওয়ারড্রবও তন্নতন্ন করে খোজা হলো। বসার ঘরে থাকা এক অফিসার আনিসাকে তার অলঙ্কার দেখাতে বলল। সে ওয়ারড্রবের দেরাজ থেকে ছোট একটি থলি বের করে অফিসারকে দিল। অফিসার বিস্মিত হলো। 'ব্যাস ইটনা হি হ্যায়, সে অবিশ্বাস্যভাবে জানতে চাইল তারপর সবাই হাসিতে ফেটে পড়ল। তারা অলঙ্কার নিয়ে গবেষণা শুরু করল। কিছুক্ষণ একসাথে থাকার পর তারা অলঙ্কার ফেরত দিল।

এই সময়টাতে আমি এবং আমার স্ত্রী কিছু মানসিক চাপের স্বীকার হয়েছিলাম। আইবি অফিসাররা আমাদের পালাক্রমে একই প্রশ্ন বারবার জিজ্ঞাসা করতে থাকলো। আমরা যেখানে বসে ছিলাম একজন লোক সেখানে আসত আর আমাদের কিছু প্রশ্ন করত। কিছুক্ষণ পর আরেকজন আসত আর অন্য কিছু প্রশ্ন করত। তারপর তৃতীয়জন আবার প্রথম সেটের প্রশ্নগুলো করত। এভাবে দুপুর প্রায় দুটো পর্যন্ত চলল।

হঠাৎ করে একজন বিদেশি সাংবাদিক লবিতে প্রবেশ করল।

'কী পাওয়া গেছে–কত অর্থ পুনরুদ্ধার হয়েছে এই অনুসন্ধানে? ' তিনি প্রশ্ন করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু কর্মকর্তা তাকে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিয়ে দরজা আটকে দিল।

'আপনারা মিডিয়াকে দেখাচ্ছেন না কেন যে আপনারা কী পেয়েছেন,' আমি ব্যাঙ্গের সুরে বললাম সাহাইকে। কোন উত্তর পাওয়া গেল না। এটাই ছিল আমার শ্বশুরের শ্রীনগরের অভিযানের থেকে আমারটার পার্থক্য, সেখানে 'পুনরুদ্ধারকৃত' জিনিস মিডিয়ার সামনে প্রকাশ করা হচ্ছিল।

অনুসন্ধান অভিযান কিছু সময় বন্ধ রাখা হলো। দলের জন্য দুপুরের খাবারের প্যাকেট এল। তারা আমাদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে খাবার খেল। খাবার পর আমাকে আর আনিসাকে শোবার ঘরে যেতে বলে তারা বাইরে থেকে দরজা লাগিয়ে দিল। আমরা সেই অগোছালো, নির্বোধের মত লণ্ডভণ্ড করা শোবার ঘরে পাঁচ ঘন্টা কাটালাম। চিন্তা ও উদ্বিগ্নতায় আমরা উভয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কেউই বুঝতে পারছিলাম না যে কী করব। অবশেষে সন্ধ্যা ৭ টায় দরজা খোলা হলো।

ততক্ষণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল যে আমার বাসায় পরিচালিত অভিযানটি ছিল আয়কর অভিযানের ছদ্মবেশে সত্যিকার অর্থে আইবি এর অভিযান। এর একটা কারণ হলো অভিযানে আইবি গোয়েন্দার সংখ্যা অনুপাতিক হারে বেশি, মনে হচ্ছিল তারাই হুকুমে আছে। আয়কর কর্মকর্তারা আইন অনুযায়ী কাজ করতে চাইছিল কিন্তু আইবি গোয়েন্দারা তাদের অগ্রাহ্য করছিল। তদের মধ্যকার মতানৈক্য আর বাগবিতণ্ডা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল।

যেহেতু আমার বাসা অনুসন্ধানের অনুমোদন এসেছিল আয়কর বিভাগ থেকে তাই অনুসন্ধান অপারেশনটি ছিল সম্পূর্ণ বেআইনি যেটা প্রফেসর রাজা চেলিয়ার নেতৃত্বে গঠিত ট্যাক্স রিফর্ম কমিটির প্রতিবেদনে স্পষ্ট। অনুসন্ধানের সময় একজন আইনি পরামর্শকের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয় :

অনুসন্ধানের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত গোপন আয় এবং সম্পদ যেমন অর্থ, অলঙ্কার, বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি খুঁজে বের করে প্রমাণ উপস্থাপন করা। ১৩২ ধারা অনুসন্ধান কর্মকর্তাকে সেই স্থানে উপস্থিত কোন ব্যক্তির বিবৃতি গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে যাতে পরবর্তীতে মামলার কার্যক্রমের ক্ষেত্রে তা ব্যাবহার করা যায়। যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদ এই অনুসন্ধান কাজের কোনো অংশ নয়, এটা নিশ্চিত করতে হবে যেন নির্ধারিত ব্যক্তিকে কোনো ভয়ভীতি দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হয় এবং জোর করে যেন স্বীকারোক্তিমূলক বিবৃতি না নেয়া হয়।

আমার ক্ষেত্রে অভিযান দল গোপন আয় বা অর্থ প্রকাশ করে এমন কোনো দলিল খুঁজছিল না। সেটাই যদি উদ্দেশ্য হতো তাহলে অনুসন্ধান কাজ দুপুর ১২:৩০ এর ভেতর শেষ হয়ে যেত কেননা গোপন আয়, অর্থ বা অলঙ্কার প্রকাশ করে এমন কোনো দলিল তারা খুঁজে পায়নি। কিছু স্বর্ণের গহনা ছাড়া তারা যা পেয়েছিল তা হলো বিশাল অঙ্কের ৩৪৫০ রুপি। যদিও এটা পরে অভিযোগপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, মিডিয়াকে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে বিশাল অঙ্কের অর্থ এবং অলঙ্কার পুনরুদ্ধার করা হয়েছে আমার ফ্ল্যাট থেকে।

অভিযান দলের সদস্যরা বরং আমার স্টাডি কাম অফিস রুমে থাকা খবরের প্রতিবেদন, বই আর কাগজপত্রের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিল। আমি রেডিও ডয়চে ভেলে (উর্দু রেডিও)-তেও কাজ করতাম। আমি নিজের হাতে উর্দুতে প্রতিবেদন লিখতাম আর টেলিফোনে সেগুলো পড়তাম। তাদের ভেতর একজন পুলিশ কিছুটা উর্দু জানত।

যখন অভিযান দলের কয়েকজন আইবি কর্মকর্তা এই কাগজগুলো দেখল তারা তাকে সেটা পড়তে বলল, অনেক বই ছড়িয়ে রইল। স্বল্প জ্ঞান আর আমার দুর্বোধ্য লেখার জন্য অসহায় লোকটি অথৈ সাগরে পড়ল। পরিশেষে তারা বেশিরভাগ রিপোর্ট বেধে নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিল পরে আরও ভালোমতো

পরীক্ষা করার জন্য। আমার ভয়াবহ অবস্থাটা চিন্তা করুন যখন তারা ডমিনিক লেপিয়ারের ফ্রিডম এট মিডনাইট বাঁধল এবং সেটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। যাহোক, অনেক বাগবিতণ্ডার পরে তারা লেপিয়ার এবং ই.এম. ফরস্টারকে খুলে রাখল। আয়কর আইন এর ১৩২(১)(৩) ধারা মোতাবেক শুধুমাত্র সেইসব বইয়ের হিসেব এবং অন্যান্য কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা যাবে যেগুলো করদাতা ১৩১ ধারা বা ১৪২(১) ধারার বিজ্ঞপ্তির জবাবে উত্থাপন করতে ব্যর্থ হবে বা উত্থাপন করবে না বা করতে পারত না।

আয়কর আইন এর ১৩২(১) ধারা অনুযায়ী, একটি আয়কর অনুসন্ধান একজন দক্ষ আয়কর কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হতে পারে, যিনি তার অর্জিত তথ্যানুসারে বিশ্বাস করবেন যে,

ক) কোন ব্যক্তি যার কাছে ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২(১৯২২ এর ১১) এর ৩৭ ধারার (১) উপধারার অধীনে অথবা এই আইনের ১৩১ ধারার (১) উপধারার অধীনে কোনো তলব অথবা ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২ এর ২২ ধারার (৪) উপধারার অধীনে অথবা এই আইনের ১৪২ ধারার (৪) উপধারার অধীনে কোনো বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে উত্থাপন করার জন্য, বা উত্থাপনের কারণ হবার জন্য, কোনো বইয়ের হিসেব বা অন্যান্য কাগজপত্র বাদ পড়েছে বা উত্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে বা উত্থাপনে ব্যর্থ হবার কারণ ঘটেছে এমন বইয়ের হিসেব বা অন্যান্য কাগজপত্র যা এই ধরনের তলব বা বিজ্ঞপ্তি দ্বারা চাওয়া হয়েছে।

খ) কোন ব্যক্তি যার কাছে পূর্বোক্ত তলব বা বিজ্ঞপ্তি আছে বা জারি করা হতে পারে, উত্থাপিত হবে না বা উত্থাপনের কারণ হবে না, কোনো বইয়ের হিসেব বা অন্যান্য কাগজপত্র যা ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২(১৯২২ এর ১১) বা এই আইনের অধীনে কোনো কার্যাবলীর জন্য প্রয়োজন বা প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

গ) কোনো ব্যক্তি যার কাছে কোনো অর্থ, স্বর্ণের বার, অলঙ্কার, বা কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা জিনিস এবং এধরনের অর্থ, স্বর্ণের বার, অলঙ্কার বা মূল্যবান দ্রব্য বা জিনিস হয় পুরোপুরিভাবে বা আংশিকভাবে আয় বা সম্পদকে (যা ছিল না বা থাকতে পারত না) ভারতীয় আয়কর আইন ১৯২২(১৯২২ এর ১১) বা এই আইনের উদ্দেশ্যকে পুরো করে (অতএব এখানে অপ্রদর্শিত আয় বা সম্পদ হিসেবে দেখানো হয়েছে)।

একটি অনুসন্ধান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপরোক্ত শর্তগুলোর কোনোটিই পাওয়া যায়নি। আয়কর আইনের আওতায় আমার বিরুদ্ধে কোনো তলব বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং একথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই যে যদি আয়কর আইন কর্তৃপক্ষ থেকে 'কোনো বইয়ের হিসেব বা অন্যান্য কাগজপত্র' চাওয়া হতো তাহলে সেটা আমি উত্থাপন করতে পারতাম না। 'অপ্রদর্শিত' আয় সম্পর্কিত তিন নম্বর শর্তটিও অনুপস্থিত ছিল।

নিম্নোক্ত জিনিসগুলো ছিল আমার বাসা থেকে পুনরুদ্ধারকৃত 'কাগজপত্র ও বইয়ের হিসেব' :

আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক একাউন্ট এর বিস্তারিত, আমি যে ফ্ল্যাটে থাকি তার নিবন্ধিত দলিল, ১০,০০০ রুপির একটি ফিক্স ডিপোজিট রসিদ, কয়েক বছর আগে একটি আবাসন কোম্পানিতে ৫০,০০০ রুপি বিনিয়োগের প্রত্যায়নপত্র যার মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল একটি ক্রসড চেক দিয়ে। সুতরাং আয়কর আইনের আওতায় কোনো শর্তেই আমার বাসা ঘেরাও করাকে সমর্থন করা যায় না। অতএব আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এটি রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত। এই কাজকে সমর্থন করার জন্য আমার শ্বশুরের নামের সাথে আমার নাম জুড়ে দেয়া হয়েছিল।

যখন আনিসা ও আমাকে শোবার ঘর থেকে বের হতে বলা হলো তখন সন্ধ্যা ৭ টা বাজে। আমরা লবিতে বসলাম এবং অভিযান দলের একজন সদস্য আমাদের টেলিভিশন চালু করলেন। বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেলে আমার বাসা ঘেরাওয়ের খবর জানাচ্ছিল। আজ তাক প্রতিনিধি দীপক চৌরাসিয়া আমার বাসার বাইরে দাঁড়িয়েছিল, আমার নামাঙ্কিত মেইল বক্সের সামনে অঙ্গভঙ্গি করছিল এবং সরাসরি প্রচার করছিল যে আমি 'পালাচ্ছিলাম'। অবশ্যই, তিনি জানতেন না যে আমি তখনও ঘরের ভেতর। তিনি বিবরণ দিচ্ছিলেন যে পুলিশ আমার ঘর থেকে অপরাধের প্রমাণসহ একটি ল্যাপটপ উদ্ধার করেছে। আমি ভেবেছিলাম যে চৌরাসিয়া এসব বিদ্বেষপরায়ণ আইবি কর্মকর্তাদের দ্বারা সত্যিই ভুল পথে চালিত হয়েছে। পরে তিনি এই নোংরা খেলা বুঝতে পারেন এবং পরবর্তীতে আমার আটকের প্রতিবাদে সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ প্রচারণায় তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

সংবাদ প্রতিবেদনটি আমাকে হতভম্ব করে দেয়। কোথেকে এল এই ল্যাপটপ যেটা আমার বলে দাবি করা হচ্ছে? আমি সাহাইকে আমার বাসস্থান থেকে পুনরুদ্ধারকৃত 'দলিল' সম্পর্কে এবং ল্যাপটপ বিষয়ে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে তিনি জানেন না এইসব প্রতিবেদকরা কীসের ব্যাপারে কথা বলছে। তিনি আমাকে নিশ্চিত করলেন যে এ ধরনের কোনো দলিল পুনরুদ্ধার হয়নি।

'আপনি একজন সাংবাদিক—আপনি নিশ্চয়ই জানেন কীভাবে সংবাদ বানানো হয়,' তিনি ব্যাঙ্গের সুরে বললেন।

পরিবেশটা বদলে গেল। আয়কর কর্মকর্তারা এখন নিশ্চিন্ত। ভারতীয় রাজস্ব সেবার লম্বা, চমৎকার মহিলা কর্মকর্তাটি যে সকালে আমাদের শোবার ঘরে জোর করে ঢুকেছিল, এখন আনিসার সাথে কথা বলছে। আমার শ্বশুরের বাসায় আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা মহিলার থেকে ইনি একটু অন্যরকম। মহিলাদের আলাপচারিতার নিজস্ব ধরন আছে। একবার বাধা পেরিয়ে গেলে তারা অনেক কথা বলতে পারে। আনিসা তার চাকরি সম্পর্কে জানতে চাইল, কীভাবে সে এতে ঢুকল এবং আরও অনেক কিছু।

'আমাদের বাসা খুঁজে পেতে আপনাদের কষ্ট হয়নি তো?' আমি তাকে বলতে শুনলাম। আইনি প্রক্রিয়ায় না থাকলে আমি খুব একচোট হাসতাম। আমি শুধু তার দিকে নিঃস্পৃহভাবে তাকিয়ে রইলাম।

লবিতে আয়কর কর্মকর্তারা তাদের শেষ সময়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম সারছিল। তারা আনিসা আর আমাকে কিছু কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে বলল। আমরা বাধ্যগতভাবে করলাম। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে তারা আমাদের এই মর্মে স্বাক্ষর নিয়েছিল যে সেগুলো অঙ্গিকারের ভিত্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে, যদিও তারা না কোনো অঙ্গিকার নিয়েছিল আর না সেসব বিবৃতি সেরকমভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল যেভাবে হওয়ার দাবি তারা করেছিল।

আমার স্টাডিতে আমাকে নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চলছিল। এসময় আমি ছিলাম পুরোপুরি দ্বিধান্বিত এবং ক্লান্ত।

একজন কর্মকর্তা এসে আমার কাছে জানতে চাইলেন যে আমার কম্পিউটারে প্রাপ্ত ফাইল 'ফোর্সেস' এর প্রকাশিত কপি আমি তাদের দিতে পারব কিনা। 'দয়া করে দুএকদিনের মধ্যে ফাইলের প্রকাশিত কপি দিন। এসব

লোকেরা আপনাকে গ্রেফতারের পরিকল্পনা করছে,' তিনি সহানুভূতির সুরে বললেন।

আমি তাকে নিশ্চিত করলাম যে ফাইলটি মূলত প্রকাশিতই। আমি তাকে প্রকাশিত একটি কপি দিব। আইবি কর্মকর্তা চলে যাবার পর আমার এক সহকর্মী আমার কাছে এসে বলল, 'তুমি ওদেরকে বুঝিয়ে শক্তি নষ্ট করছ কেন? তারা তোমার জন্য এসেছে—তোমাকে গ্রেফতার করবে।'

শুধুমাত্র গ্রেফতার শব্দটির উল্লেখ আনিসাকে আতঙ্কিত করে তুলল। সে সাহাই এর কাছে দৌঁড়ে গেল এবং জানতে চাইল, 'আপনারা কি ওকে গ্রেফতার করবেন?'

'না, আমরা তাকে গ্রেফতার করব না। আমাদের সেই ক্ষমতা নেই,' সাহাই তাকে আশ্বস্ত করল।

আনিসা নিশ্চিন্ত হলো না। সে মজিদের দিকে ফিরল যাকে এই অপারেশন এর নেতা মনে হচ্ছিল।

'চিন্তার কিছু নেই। কিছুই হবে না। রাত ৯ টার দিকে দিল্লি পুলিশের সহকারী কমিশনার (বিশেষ সেল) রাজবির সিং আমার স্টাডি থেকে বেরিয়ে এলেন। যেহেতু আমি তাকে আগে দেখিনি তাই ধারণা করলাম যে আনিসা আর আমাকে যখন শোবার ঘরে আটকে রেখেছিল তখন ফ্ল্যাটে এসেছেন। তিনি সাদাপোষাকের একজনের দিকে ইঙ্গিত করলেন, এবং আমাকে নির্দেশ করে বললেন, 'তাকে তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলুন।'

আমি উপলব্ধি করলাম যে তারা সত্যিকার অর্থে আমার জন্যই এসেছে।

তিন

ধোঁয়া ও আয়নাগুলো

আনুষ্ঠানিকভাবে অনুসন্ধান কাজ শেষ হলো। ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর গোয়েন্দারা দিল্লি পুলিশকে তাদের আদেশ শেষ করতে প্ররোচিত করল, এবং কাজ সফল হয়েছে এই আশা করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর রাজবির সিং তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

যাহোক, আয়কর আইন বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট কিছু আনুষ্ঠানিকতা সারা বাকি ছিল। যখন তারা কিছু কাগজে আনিসা ও আমার স্বাক্ষর নিয়ে বেরিয়ে গেল তখন রাত দশটার বেশি বাজে। আমি ঘরের চারদিকে তাকালাম। ঘরটা একটা কসাইখানা হয়ে ছিল। বই কাগজ, পত্রিকার ছেড়া টুকরা, কাপড়, গৃহস্থালি জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। যেন এর ভেতর দিয়ে চলন্ত জনতার ঝড় বয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম যে এ ধরনের প্রশিক্ষণই কি প্রশিক্ষণ বিভাগ তার কর্মকর্তাদের দিয়ে থাকে।

আমি বুঝতে পারিনি যে পেছনে দুজন সাদাপোষাকের কর্মকর্তা রয়ে গেছেন। তারা ছিলেন ইন্সপেক্টর রমন লাম্বা এবং সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) এন.এস.রানা। 'আপনাদের আরও কিছু লাগবে?' আমি জানতে চাইলাম। আনিসা ভয় পেয়ে গেল। 'আপনারা কি ওকে গ্রেফতার করবেন?'

'না, না। তেমন জরুরি কিছু নয়। ওনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে,' ইন্সপেক্টর লাম্বা তাকে আশ্বস্ত করল। ঠিক সে সময় আমার ফোন বাজল। তারা আমাকে ফোন ধরার অনুমতি দিল। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর আশা খোশা ফোন করেছিল। আমার বাসা থেকে 'প্রতিরক্ষা দলিল' পুনরুদ্ধারের খবর ছড়িয়ে পড়েছে, তিনি বললেন এবং কী ঘটছে তা জানতে চাইলেন। আমি সংক্ষেপে তাকে সব ব্যাখ্যা করলাম আর বললাম দলিলে কোন শ্রেণিবদ্ধ তথ্য নেই। এটাই ছিল দীর্ঘ সময়ের জন্য আমার ধরতে পারা শেষ কল।

কিছু পরে ইন্সপেক্টর লাম্বা আমাকে তৈরি হয়ে তার সাথে যেতে বললেন। লোধি কলোনির দিল্লি পুলিশের বিশেষ সেলের নাম্বার এএসআই রানা আনিসাকে

দিল, যাতে প্রয়োজনে সে যোগাযোগ করতে পারে এবং তাকে আবারও বলল যে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর তাড়াতাড়িই আমাকে ফেরত পাঠানো হবে।

আমি দেখলাম যে কীভাবে টেলিভিশন চ্যানেলগুলো আমার বাসায় অভিযানের ব্যাপারটা রোমাঞ্চকর করে তুলেছে। আমার কাছে মনে হলো যে আইবি কর্মকর্তারা যেন তাদের সব তথ্য খাইয়ে দিয়েছে। তবুও তারা বাইরে অপেক্ষায় আছে আমার পক্ষ থেকে 'ব্রেকিং নিউজ' আর 'এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট' শোনার আশায়। তারা যে এভাবে আমাকে তামাশায় পরিণত করেছে, আমার সুনাম ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে তার কোনো গুরুত্বই তাদের মাঝে নেই। আমি ইন্সপেক্টর লাম্বাকে অনুরোধ করলাম একটা নীরব প্রস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। তিনি রাজি হলেন এবং আমার কাছে জানতে চাইলেন যে কোনো বিকল্প রাস্তায় আমরা যেতে পারি। কোনো বিকল্প রাস্তাই ছিল না। কম্পাউন্ডে যাবার একমাত্র রাস্তাটায় ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, আর মিডিয়ার লোকজনে গিজগিজ করছিল তাদের গল্পে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর মতো আলোকচিত্র, ছবি বা সংবাদের পরিধি বাড়ানোর ক্ষুধা নিয়ে। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা এমন সাধারণভাবে জায়গাটা ছেড়ে যাব যেন সরকারি কর্মকর্তারা ভবন ছেড়ে যাচ্ছেন। পুলিশের লোকেরা কেউ আমার সাথে যাবে না যেমনটা তারা কাউকে থানায় এগিয়ে নিয়ে যাবার সময় করে। চালটা কাজে লাগল। কেউ আমাদের পরিচয় টেরও পেল না আর আমরা তাড়াতাড়ি একটা মারুতি গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেলাম।

আনিসা সম্পূর্ণ একা রয়ে গেল। এলমেলো গৃহস্থালি জিনিসপত্রের মাঝে বসে সে বুঝতে পারছিল না কি করা উচিত। আমাদের বাসার অবস্থাটা যেন তারই মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। পুরোপুরি আবেগশূন্য এবং একদম দ্বিধান্বিত হয়ে সে বারান্দায় গিয়ে একজন প্রতিবেশীকে ডাকল। মহিলা বাইরে এলেও তার স্বামী সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভেতরে ডেকে নিল। আর এমনই রইল বাকি সাতটি মাস। যতদিন না মিডিয়া আমার নির্দোষিতায় আলোকপাত করল, আনিসা আর আমার বাচ্চারা সেই এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপন করতে লাগল। দরজাগুলো মুখের উপর বন্ধ হয়ে যেত আর বাচ্চাদের টেনে ঘরে বন্দি করে রাখা হতো যদি তারা কম্পাউন্ডের ভেতর ঢোকার সাহস দেখাত।

যখন আনিসা হতাশায় ডুবে যাচ্ছিল সে সময় সাদাপোষাকের একজন লোক দরজায় দেখা গেল এবং সে বলল যে সে দিল্লি পুলিশ থেকে এসেছে তার দেখাশোনা করার জন্য। খুব নম্রভাবে সে বলল যে সে বাসার বাইরে থাকবে এবং কোন প্রয়োজনে তার সাহায্য নিতে পারবে। সুস্পষ্টভাবে, দিল্লি পুলিশ আমাকে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যদিও তারা আনিসাকে বলেছিল যে আমাকে কয়েক ঘন্টার ভেতর ফেরত দেয়া হবে।

আমরা যখন লোধি কলোনির দিল্লি পুলিশ সেলে পৌছালাম তখন ১০:৩০ বাজে। আমাকে ইন্সপেক্টর লাম্বার লাগোয়া একটি রুমে নেয়া হলো। মজিদ সেখানে ছিল। বিদ্বেষপূর্ণ কাষ্ঠহাসি হেসে সে বলল, 'আপনি এখন এর ভেতর চৌদ্দ বছর থাকতে পারেন।'

রুমে থাকা অন্য অফিসারের কাছে ব্যাপারটা খারাপ শোনাল। তিনি কড়া জবাব দিলেন, 'ও তুমি এখন ভারতের প্রধান বিচারপতি হয়ে গেছ না? তুমিও রায় দিবে নাকি?' তার এ হস্তক্ষেপের জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম।

আমার হাত, পা ঠাণ্ডা ছিল। আমি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে আমি কোনো ভুল করিনি, অবশ্য এ ধরনের উদ্ধত কর্তৃপক্ষের সামনে সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষটিও ভেঙে পড়বে। তাছাড়া আমি দিল্লির পুলিশের বিশেষ সেল সম্পর্কেও শুনেছিলাম। এটা বানানো হয়েছিল সন্ত্রাসী ঘরানার লোকদের জন্য এবং প্রতিবার যখনই কোন সন্ত্রাসী গ্রেফতারের বা সংঘর্ষের খবর পাওয়া যেত, মিডিয়া এই সেলের কর্মকর্তাদের আর তাদের কর্মদক্ষতার উপর আলোকপাত করত। ফলে এই সেলের একটা ভীতিকর সুখ্যাতি ছিল। এসব গ্রেফতার আর সংঘর্ষের কয়টা যে সত্য তা আন্দাজ করার ব্যাপার।

টেলিভিশন আর পত্রিকার অন্যতম পরিচিত মুখ ছিল এসিপি রাজবির সিং, মিডিয়ায় যার খেতাব 'এনকাউন্টার স্পেশালিষ্ট'। এভাবেই তাকে আমি আমার বাসায় চিনেছিলাম। তার লম্বা, সুন্দর, বলিষ্ঠ অবয়ব আর কর্তৃত্বপরায়ণ চালচলন কাস্টডির যে কারও মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বইয়ে দিতে পারে। কিন্তু রাজবির সিং বাঁধাধরা নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণিত হলেন। তিনি একজন ভদ্র কর্মকর্তা যিনি নিয়ম মেনে চলার পক্ষপাতী।

ইন্সপেক্টর লাম্বার পাশের অফিসটি দেখতে সাদাসিধা নির্দোষ ধরনের, শুধু কয়টা চেয়ার আর একটা টেবিল। এটা সত্যিকার অর্থে একটা জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ,

পুরোপুরি সাউন্ডপ্রুফ। একটা ভারীকাজের শীতাতপ যন্ত্র, দেয়ালে দুটি রহস্যময় কালো পর্দা আর শক্তিশালী বিদ্যুৎ বাল্ব দিয়ে সজ্জিত। আমি পরে জেনেছিলাম যে রুমের তাপমাত্রা জমে যাওয়া তীব্র শূন্য থেকে ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। ভাগ্যবশত, আমি এর সক্ষমতার অভিজ্ঞতা গ্রহণ থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম।

আমাকে রুমের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো এবং একটি চেয়ারে বসতে বলা হলো। আমি শুনলাম এসিপি রাজবির সিং, ইন্সপেক্টর লাম্বা, এএসআই রানা আর সাব-ইন্সপেক্টর (এএসআই) অশোক কুমারকে বললেন যে আমার সাথে যেন কোন খারাপ ব্যবহার না করা হয় কারণ আমি রাজনৈতিক কারণে গ্রেফতার হয়েছি। তারপর তিনি চলে গেলেন, বাকি তিনজন তাকে এগিয়ে দিয়ে এল।

একজন কনস্টেবল রুমে এসে আমাকে কিছুটা কর্কশভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার নাম কী?' আমি নাম বললাম। তিনি আমাকে আমার কাছে যা কিছু আছে দেখাতে বললেন এবং কাগজের উপর সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করতে শুরু করলেন। একে বলা হয় জামা তালাশ বা ব্যক্তিগত খোঁজ।

কিছুক্ষণ পর ইন্সপেক্টর লাম্বা, এএসআই রানা আর এসআই অশোক রুমে ফিরে এলেন। ইন্সপেক্টর লাম্বা জানতে চাইলেন রাতের ডিউটিতে কে থাকবেন। তাকে বলা হলো অশোক আর অন্য একজন পুলিশ থাকবে। অশোকের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর লাম্বা বললেন, 'দেখো উনার যেন কোনো হয়রানি না হয়। উনি আজ সারারাত এখানে থাকবেন—শুধু একটা কম্বলের ব্যবস্থা কর।'

শীঘ্রই আমি রুমে একা হয়ে গেলাম আর মেঝেতে হাতপা ছড়িয়ে বসলাম। কিন্তু ঘুমই ছিল আমার সর্বশেষ ভাবনা। পুরো দ্বিধা আর হতাশা নিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম যে এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু আমার মন পরিষ্কারভাবে চিন্তা করতে পারছিল না। রাতের কোন এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কারণ তখন পাঁচটা বেজে গেছে যখন এসআই অশোক কুমার এসে আমাকে জাগালেন। তিনি আমাকে ফ্রেশ হতে বললেন আর চা অফার করলেন। আমার শেষবার চা খাওয়ার পুরো বিশ ঘন্টা পার হয়েছে তখন।

এসআই অশোক কুমার রাতের বেলায় প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। দৃশ্যত জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া শুরু হলো। এসব কর্মকর্তারা কোর্ট থেকে আমার রিমান্ড

নেবার মূলে রয়েছেন। সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছেন যে, এই উদ্দেশ্যে 'প্রতিরক্ষা দলিল' প্রদর্শন করাই যথেষ্ট নয়।

আমার কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিল কোন গোপন জিনিস ছিল না। মূলত এটা ছিল বছরখানেক আগে ইন্টারনেট থেকে নামানো একটা প্রবন্ধের তিনটি সংযুক্ত অংশ। আসল কপিটি ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডি, ইসলামাবাদ থেকে ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত আর তাদের ওয়েবসাইটে এটা বিদ্যমান। আমাদের ডিফেন্স স্টাডিজ এন্ড অ্যানালাইসিস (আইডিএসএ)-এর পাকিস্তানি রূপ এটা। 'ইসলামাবাদ পেপার সিরিজ' নামে এর একটা প্রকাশনা সিরিজও আছে। জানুয়ারি ১৯৯৬ তে ড. নাযির কামাল কর্তৃক এটা একটি পেপার প্রকাশ করে যার শিরোনাম ছিল 'ডিনায়াল অফ ফ্রিডম এন্ড হিউম্যান রাইটস: এ রিভিউ অব ইন্ডিয়ান রিপ্রেশন ইন কাশ্মীর।

ড. নাযিরের পেপারে মূলত কাশ্মীরের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, বিভিন্ন ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন যেমন 'কমিটি ফর ইনিশিয়েটিভ ইন কাশ্মীর (নয়া দিল্লি), দ্য পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (নয়া দিল্লি), হিউম্যান রাইটস কমিশন (শ্রীনগর), দ্য ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস অরগ্যানাইজেশন (লুধিয়ানা,ভারত), এবং দ্য ইনস্টিটিউট অব কাশ্মীর স্টাডিজ (ভারত) এর উদ্ধৃতি দিয়ে।

আমার চার্জশিটে সংযুক্ত দলিলটি এই পেপারের ভেজালযুক্ত সংস্করণ। দৃশ্যত, আইবি গোয়েন্দারা এর মধ্যে অবৈধ সংস্কার করেছে যখন তারা আমার বাসায় ছিল আর আনিসা ও আমি শোবার ঘরে বন্দি ছিলাম। ওয়ার্ডস্টার ফরম্যাটে থাকা দলিলটির উপরে তারা এই লাইনটি লিখে দিয়েছে 'শুধুমাত্র উল্লেখের জন্য, প্রকাশ বা প্রচারণার জন্য নয়।' তাছাড়া, তারা 'ভারত-শাসিত কাশ্মীর' এই শব্দ দুটি বদলে 'জম্মু ও কাশ্মীর' লিখে দিয়েছে। দিল্লি পুলিশের কাছে উপস্থাপিত দলিলটি সংযুক্তি এ, বি, এবং সি এর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডাটাবেজ নিয়ে গঠিত। তারা সংযুক্ত সদস্যদের নাম সরিয়ে ফেলায় এটি একটি শ্রেণিবদ্ধ দলিলের মতো লাগছিল। এই পরিবর্তিত দলিলের ভিত্তিতে সিক্রেট অ্যাক্ট আইন, ১৯২৩ এর অধীনে আমার নামে ক্রিমিনাল কেস দেয়া হয়।

আইএসআই, ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্স অব পাকিস্তানের একজন সদস্য হয়ে ভারতীয় আর্মি এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর

সেনা মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও চালান করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছিল আমার বিরুদ্ধে।

কোর্টের পুরো কার্যধারাতে দলিলটি একটি আটকানো খামে রাখা ছিল এবং আমি আর আমার আইনজীবীরা ওটা দেখার অনুমতি পাইনি। আমি বারবার আইবি এবং দিল্লি পুলিশকে বলেছি যে এই দলিলটি ছিল একটা প্রকাশিত দলিল আর আমি আমার কম্পিউটারে সেটা আমি রেখেছিলাম শুধু উল্লেখ করার প্রয়োজনে, কোনো সুবিধা লাভের জন্য নয়।

আইবি কর্মকর্তারা আমার বিরুদ্ধে কোর্টকে প্ররোচিত করার জন্য আরেকটি দলিল নিয়ে আসে এবং বলে যে আমি হিজাব-উল-মুজাহিদীন এর ভেতরের লোকও। এই দলিলটি আসলে কাশ্মীরের উপর প্রতিবেদন তৈরি করা সাংবাদিকদের মাঝে ইন্ডিয়ান ইনটেলিজেন্স কর্মকর্তাদের দ্বারা প্রচারিত একটি নোট। বিভিন্ন পত্রিকায় এই অনুপ্রাণিত নোটকে ভিত্তি করে অনেক খবর ছাপা হয়। অবশেষে চার্জশিট দাখিলের সময় এই নোটটি বাদ পড়ে যায়।

এ সময়, আমি এরকম প্রতিহিংসাপরায়ণ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়ার পুরো হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কাশ্মীর টাইমস এবং ডেইলি টাইমস অব পাকিস্তানের সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার কারণে, আমি কাশ্মীর সম্পর্কিত অনেক স্পর্শকাতর বিষয়ে প্রতিবেদন করতাম। সংশ্লিষ্ট দলের স্বার্থের ব্যাপারে অনবহিত হয়ে, আমি কোনোরকম ভয় বা আনুকূল্য ছাড়াই আমি বিভিন্ন ঘটনা ও ব্যাপারে প্রতিবেদন করতাম। কিছু আইবি কর্মকর্তা কাশ্মীর টাইমসে প্রকাশিত আমার কিছু প্রতিবেদন বিরক্তিকর ভেবেছিলেন। এরপরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমাকে আমার কাজের জন্য মাশুল দিতে হচ্ছে।

একজন শীর্ষস্থানীয় হুরিয়াত নেতা, সৈয়দ আলি আলি শাহ গিলানির কন্যাকে বিয়ে করাটাও তাদের কাজের জন্য সুবিধাজনক ছিল। তারা আমাকে তার সাথে জুড়ে দিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছিল। এটা তাদের মামলাকে শক্তিশালী করে এবং তারা সরকারকে তাদের খেলায় সঙ্গী করতে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা তথ্য একত্র করে আমি আমার বাসার অভিযানের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা পুর্ননির্মাণ করতে সক্ষম হই। আইবি প্রায় তিনটার দিকে দিল্লি পুলিশকে জানায় যে গুপ্তচরবৃত্তির একটা ঘটনা ঘটেছে। এসিপি

রাজবির সিং, ইন্সপেক্টর রাম মেহার সিং এবং দিল্লি পুলিশের অন্যান্য কর্মকর্তারা আমার বাসভবনে আসেন। ইন্সপেক্টর রাম মেহার সিং মামলা গ্রহণ করতে অনীহা জানান কারণ তিনি এর আগে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টস ১৯২৩(ওএস) এর অধীনে কোন মামলা নিয়ে কাজ করেননি।

সুতরাং অন্য দিল্লি পুলিশ কর্মকর্তা খোজা শুরু হলো। স্পেশাল ব্রাঞ্চের মদনজিত সিংকে আমার বাসস্থানে ডাকা হলো, তিনি ওএস এর অধীনে কেস ঘাটাঘাটি করেছিলেন। ইন্সপেক্টর মদনজিত সিং 'ফোর্সেস' নামক ফাইলটি দেখে মতামত দিলেন যে ওএস অ্যাক্টের কোন লঙ্ঘন দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি কেস নিবন্ধন করতে এবং আমাকে গ্রেফতার করতে অস্বীকৃতি জানালেন আর পরামর্শ দিলেন যে দলিল নিয়ে ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মিলিটারি ইনটেলিজেন্স (ডিজিএমআই) এ পাঠিয়ে এদের পরামর্শ নিতে। শুধুমাত্র ডিজিএমআই যদি সমর্থন করে যে দলিলটি একটি গোপন দলিল এবং এতে দেশের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর কিছু থাকতে পারে, তবেই আমার বিরুদ্ধে কেস দেয়া যাবে, তিনি জানালেন। তাকে চলে যেতে বলা হলো।

সারাদিন ধরে অভিযানে উপস্থিত থাকা মজিদ, জোসিকে একটি ফোন করল, যিনি আইবির একজন সহকারী পরিচালক, একইসাথে শ্রীনগর ও দিল্লি থেকে চলা পুরো অপারেশনের দায়িত্বে আছেন। তার সরাসরি বড়দের উপেক্ষা করে তিনি এস.এম গবাকে বিষয়টা জানালেন যিনি আইবির অন্য শাখার (কাউন্টার এসপিওনেজ) একজন ডিসিআইও, যার পদমর্যাদা পুলিশের একজন সহকারী কমিশনারের সমপর্যায়ের, যত পুরস্কার তিনি পেয়েছেন সে অনুপাতে।

গবা আমার বাসায় অভিযানের সময় এসে দলিলের একটি কপি নিলেন। আরো আগেই অপারেশনের কথা তৎকালীন স্বরাষ্ট্রসচিব কামাল পান্ডে, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল.কে আদভানির কাছে পৌছে গেছে।

মজিদ এবং গবা তখনও তাদের সাহায্য করার মতো কোনো দিল্লি পুলিশ খুঁজে পাননি। তারা এসিপি রাজবির সিংকে উপযুক্ত কাউকে খুঁজে বের করতে বললেন। সবশেষে ইন্সপেক্টর রমন লাম্বাকে কেস নড়াচড়ার জন্য বাছাই করা হলো। রাত ৮:০০ টায় তিনি আমার বাসায় এলেন। তখন আমি লবিতে বসা ছিলাম।

সেখান থেকে আমি আমার স্টাডিতে চলা আলোচনার কিছু অংশ পরিষ্কারভাবে শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছু আইবি কর্মকর্তারার করা অভদ্র ভাষার ব্যাবহার আমাকে অস্বস্তিতে ফেলল কারণ সেখানে আমার স্ত্রী ছিল। আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল ধৃত দলিলের ধরন নিয়ে। আমি আকস্মিকভাবে শুনতে পেলাম ইন্সপেক্টর রাজবির সিং বলছেন যে কীভাবে দলিলটিকে সিক্রেট বলে দাড় করানো যায়—আমি একজন সাংবাদিক আর আমি নিজেই সেটা লিখতে পারতাম। ইন্সপেক্টর লাম্বা দলিলটি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করলেন আর বললেন যে আমাকে তিনি কিছু প্রশ্ন করতে চান।

তখন গবা বললেন যে তাদের আমাকে গ্রেফতার করতে হবে যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে কথা পৌঁছে গেছে আর মিডিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা দলিল পুনরুদ্ধারের খবর প্রকাশ পেয়েছে।

তিনি তার বড়দের কাছে ফোন করলেন আর জানালেন যে দিল্লি পুলিশ ডিজিএমআই এর মতামত ছাড়া আমাকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছে না। গবার বড়রা দলিল না দেখেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে প্ররোচিত করলেন, দিল্লি পুলিশ কমিশনার অজয় রায় শর্মাকে দিয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য। কোন উপায়ন্তর না দেখে, এসিপি রাজবির সিং ইন্সপেক্টর লাম্বাকে বললেন ক্রিমিনাল কেস দিতে আর আমাকে গ্রেফতার করতে।

এভাবেই শেষে আমাকে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলে দেয়া হলো। তদন্ত শুরু হলো। প্রতিটি সম্ভাব্য দৃষ্টিকোণ থেকে আমার ফিঙ্গার-প্রিন্ট, ফুট-প্রিন্ট আর ছবি নেয়া হলো। আইবি কর্মকর্তারা থানায় জড়ো হলো এবং ইন্সপেক্টর লাম্বা বক্তৃতা দেয়া দিচ্ছিলেন যে কোন পদ্ধতিতে তিনি আমার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিবেন। ইন্সপেক্টর লাম্বা গবাকে বললেন যে, আমি জোর দিয়েছি যে দলিলটি প্রকাশিত এবং এই দলিলের ছাপা কপি আমি তাকে দেয়ার চেষ্টা করব।

'সে কখনওই ওটা দেখাতে পারবে না,' গবা বলল আত্মবিশ্বাসের সাথে। 'যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে শুধু সেভাবেই আগাও আর মনের মধ্যে কোনো সন্দেহ পুষে রেখ না।'

রাত ৮:০০ টার দিকে আনিসা থানায় এসে পৌঁছাল। গবা তাকে অ্যারেস্ট মেমোর একটি কপি দিল এবং এতে স্বাক্ষর করতে বলল। 'আপনারা তাকে সত্যিই গ্রেফতার করছেন?' সে প্রায় অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইল।

পুরো অসহায়তা ও নম্রতার ভান করে গবা উত্তর দিল, 'আমরা কী করব, আইন অন্ধ।'

অ্যারেস্ট মেমোতে স্বাক্ষর করে আনিসা কড়া ভাষায় বলল, 'আমিও শুনেছি আইন অন্ধ কিন্তু বুঝতে পারিনি কতটা অন্ধ।' 'আসলে আপনাদের মতো মানুষরাই অন্ধ।'

আনিসাকে আমার জন্য কিছু খাবার আনার অনুমতি দেয়া হয়েছিল যেটা ছিল আমার জন্য খানিকটা স্বস্তির ব্যাপার। সে বলল মিডিয়া পুরোদমে থানার বাইরে অবস্থান করছে। আমি ইন্সপেক্টর লাম্বাকে অনুরোধ করলাম তাদের সামনে আমাকে প্রদর্শন না করার জন্য। কিন্তু টেলিভিশন এবং পত্রিকায় নিজেদের চেহারা দেখাতে উৎসুক কিছু পুলিশ আমাকে বাইরে নিয়ে এল আর চোখধাঁধানো আলোতে তুলে ধরল।

দিল্লির চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) সঙ্গিতা ধিংগ্রা সেহগালের সামনে উত্থাপন করা হলো। তিনি আমাকে আমার কাছ থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম যে এসব লোকেরা অকারণে একটি প্রকাশিত দলিলের ব্যাপারে উত্তেজিত হচ্ছে। এটা গোপন কিছু না, আমি আরও বললাম। কিন্তু আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হলো না। কোর্ট আমাকে পাঁচদিনের জন্য পুলিশী রিমান্ড দিল।

এই পাঁচদিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছিল কিছু আইবি কর্মকর্তার নির্দেশে, আমি পরে জেনেছিলাম। তাদের ইচ্ছা ছিল আমাকে জম্মু নিয়ে গিয়ে কিছু আরডিএক্স ঢোকাবে তারপর দেখাবে যে আমার কাছ থেকে আরডিএক্স পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আরডিএক্স এবং স্বতন্ত্র সাক্ষীর ব্যবস্থাও করা হয়ে গেছে। এর ভেতর, আইবি দলিলের ব্যাপারে ডিজিএমআই এর থেকে ভেজাল মতামতের ব্যবস্থা করে ফেলল। পুলিশের একজন সহকারী কমিশনার ডিজিএমআই এর থেকে যোগাযোগটি দেখেছিল এবং আইবি কর্মকর্তাদের জানায় যে আমাকে জম্মু নেয়ার পরিকল্পনাটি তারা বাদ দিতে পারে। ডিজিএমআই থেকে আসা মতামতটি আমাকে পাঁচবছর কারাগারে রাখতে পারবে। আইবি কর্মকর্তারা তৎক্ষণাৎ পরিকল্পনাটি বাদ দেয়। আমার এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত যে এটা ছিল আমার কিছু সাংবাদিক বন্ধুর প্রচেষ্টা যারা এল.কে আদভানি থেকে নিশ্চয়তা নিয়েছিল যে আমাকে কাশ্মীরেও নেয়া হবে না বা তৃতীয় শ্রেণির

কোন আচরণও করা হবে না যা আমাকে দেয়া হয়েছে। যদিও আদভানি আমাকে নির্দোষ ভাবেননি, তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের আমার বন্ধুদের অনুরোধ অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

দিনের বাকি সময় ছিল গতানুগতিক। স্পেশাল সেল ভবনের পেছনের একটি রুমে আমাকে রাখা হয়েছিল।

পরদিন ১১ জুন, আনিসা আর আমার বন্ধু আনুহিতা মজুমদার আমাকে দেখতে এল। তাদের দুজনকেই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। আনুহিতা সরাসরি কাজের কথায় চলে এল, 'তুমি কোর্টে কী বলেছ?' আমি তাকে সিএমএম এর সাথে আমার কথোপকথনের ব্যাপারে বললাম। ঠিক তখনই একজন পুলিশ দ্রুতবেগে ঢুকল এবং তাকে বের হয়ে যেতে বলল।

কিন্তু তারপর একটি প্রখ্যাত দৈনিকে খবর ছাপা হয় যে আমি কোর্টের সামনে আইএসআই এর হয়ে কাজ করার কথা স্বীকার করেছি। আমি এমনকি একথাও বলেছি যে সৈয়দ আলি শাহ গিলানি আমার কাছে তার কন্যা বিয়ে দিয়েছেন কারণ তিনি আমার জিহাদি কাজকর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন।

আইবি কর্মকর্তারা আমাকে ধরার ব্যাপারটিকে বড় সাফল্য হিসেবে ব্যাপকভাবে প্রচার করে। অনেক পত্রিকায় আমার সাথে পুলিশের পোজ দেয়া ছবি ছাপে, যেন তাদের পুরস্কার। ছবিটি আমাকে কিছু বিনোদনের খোরাক জুগিয়েছে। একজন পুলিশ আমাকে বলেছিল যে তার এক সহকর্মী তার পশ্চিমের উত্তর প্রদেশের বাড়ি থেকে ফোন পেয়েছিল। সে তাকে জানায় যে তার ছবি দৈনিক জাগরণের স্থানীয় সংস্করণে ছাপা হয়েছে। তার পাঁচ বছর বয়স্ক ভাগনে লাইনে আসে। 'আঙ্কেল, তুমি ওই সন্ত্রাসী ধরেছ? আমি বিশ্বাস করি না। তুমি তো এখানে একটা মুরগির বাচ্চাও ধরতে পারো না, আবার আমাকে।'

সারাদিন কোন জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি যদিও মজিদ কিছুক্ষণ পরেই থানায় এসেছিল। ইন্সপেক্টর লাম্বা তাকে আমার সামনেই জিজ্ঞাসা করেছিল যে কেন কোনো আইবি কর্মকর্তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসছে না। মজিদ বলেছিল যে তার কাজ শেষ। অন্যরা আমার ব্যাপারটা দেখবে। তার ভাজার জন্য বড় মাছ আছে।

ওই রাতে ডিনারের পর আমাকে লোধি থানা পুলিশ কলোনিতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং লক-আপে আটকে রাখা হলো। রুমের ভেতর কোন ফ্যান বা

বৈদ্যুতিক বাতি ছিল না। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসতে আমার কিছুটা সময় লাগল। সেলের চারদিকে তাকাতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম একজন দুর্বল যুবক ব্যাথায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে ছিল আলতাফ ওয়ানি, একজন নগণ্য কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা। পুলিশ তার কাছে একটি মিলিয়ন ডলারের নোট পেয়েছে। পুলিশ সম্ভবত জানে না যে ইউএস স্টেট সরকার এ ধরনের কোন নোট চালু করেনি এবং এর শুধু স্মারক মূল্য আছে। কোর্টের কাছে বিবৃতিতে, ওয়ানি বলেছে যে পুলিশ ২৫,০০০ রুপির মিথ্যা মুদ্রা এবং দুই কেজি আরডিএক্স তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। ওয়ানি আমাকে বলেছে যে বারো দিন আগে বিমানবন্দরে যাবার পথে তাকে তুলে আনা হয়। রেকর্ডে বলা হয়েছে, প্রতিবেদন অনুযায়ী তাকে লাহোরি গেট থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলতাফ ওয়ানি আমাকে বলেছে যে তাকে দিনে মারাত্মকভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। তাকে নগ্ন করে সাব-জিরো তাপমাত্রায় ফেলে রাখা হয়েছে, বরফ ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দেয়া হয়েছে এবং তারপর নির্মমভাবে পেটানো হয়েছে। পুলিশ তাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেনি এবং সে সত্যিই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল যে কেন তাকে এভাবে পেটানো হচ্ছিল। আমি যখন ছাড়া পাই তখনও আলতাফ ওয়ানি কারাগারে ছিল।

১২ই জুন আনিসা ড. নাযির কামালের পেপারের প্রকাশিত সংস্করণের একটি ফটোকপি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সে পুলিশের কাছে দলিলটি জমা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ভয় পাচ্ছিল যে দলিলটি হয়তো রেকর্ডে রাখা হবে না। তাকে আশ্বস্ত করা হলো যে স্পেশাল সেলের যুগ্ম কমিশনার এবং ইন-চার্জ ড.কে.কে. পাল একজন ন্যায়পরায়ণ কর্মকর্তা এবং দলিলের কোন ক্ষতি তিনি হতে দেবেন না। শুধুমাত্র তখনই আনিসা দলিলটি পুলিশের কাছে জমা দেয়। এটা আরও একবার ডিজিএমআই এর কাছে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। ডিজিএমআই এর ছয় মাস লাগে এর ব্যাপারে তাদের মন্তব্য জানাতে। কিন্তু সেটা ছিল ভিন্ন বিষয়।

অভিযোগে অভিযুক্ত দলিলের প্রকাশিত সংস্করণের উপস্থিতি আইবি কর্মকর্তাদের মধ্যে মামলা চালানোর ব্যাপারে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তারা আমার বাসা চষে ফেলেও এর কোনো চিহ্ন পায়নি। আর এটা এখন এখানে। স্পেশাল সেল সোজাসুজি আটকে গেল। কিছু আইবি গোয়েন্দা এর ব্যাপারে মাঠে নামল।

পুলিশ কর্মকর্তারা তাদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করল যাতে তারা মামলাটা বাদ দেয় কারণ কোন অপরাধ হয়নি। ইন্সপেক্টর লাম্বার রুম সংলগ্ন আমার রুম থেকে আমি এসিপি রাজবির সিংকে তাদেরকে বলতে শুনছিলাম যে প্রকাশিত সংস্করণ সবকিছু একদম পরিষ্কার করে দিয়েছে। কিন্তু গবা, মজিদ এবং তাদের সঙ্গিরা হাল ছাড়তে চাননি। তারা একমত হলো যে কোনো অপরাধ হয়নি, কিন্তু আমাকে এত সহজে ছাড়া যাবে না।

ইন্সপেক্টর রাজবির সিং তার জায়গায় স্থির হলেন। তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন যে যেহেতু আমি একজন সাংবাদিক, অনেক সাংবাদিক আমার মামলায় তীব্র আগ্রহ দেখাচ্ছে। তিনি এটা পরিষ্কার করে দিলেন যে তিনি মামলাটা চালাবেন শুধুমাত্র সহজপ্রাপ্য সাক্ষ্যর ভিত্তিতে। তিনি বললেন যে তিনি দলিলটি ডিজিএমআই এর কাছে তাদের মতামতের জন্য পাঠাবেন। গবা সন্তুষ্ট হলো না।

সেদিন বিকেলে একজন আইবি কর্মকর্তা আমার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি ছিলেন একজন বয়স্ক ভদ্রলোক, হাসিখুসি, ভদ্র। তিনি আমাকে দলিল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। বরং, তাকে তার জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাকে জানানোতেই বেশি আগ্রহী মনে হলো। তার অন্যতম প্রিয় প্রক্রিয়া হচ্ছে অভিযুক্তের মলদ্বারে মরিচের গুড়া ঢুকিয়ে দেয়া। প্রাণবন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করে তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে তৃতীয়-মাত্রা প্রক্রিয়ায় একজন মানুষের কী অনুভূতি হয় এবং দাবি করে যে তারা ভারতের যোগ্য। বিশাল অত্যাচার পদ্ধতির মধ্যে বেশিরভাগই সাধারণ এবং নিষ্ঠুর। অন্যগুলো আরও বাস্তবধর্মী এবং প্রযুক্তি ব্যাবহার করে ব্যাথা কম দেয়া হয় আর অল্পসল্প দাগ বোঝা যায়।

এই ছিল অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাধারণভাবে ব্যবহৃত তৃতীয়-মাত্রা প্রক্রিয়ার সাথে আমার পরিচয়। যখন আমি পুলিশ কাস্টডিতে ছিলাম কয়েকজন আইবি কর্মকর্তা এটা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমি এটা আস্ফালন ভেবে বাদ দিয়ে দিতাম যদি না পরবর্তীতে তিহার কারাগারে আমার কয়েকজন সহচর বন্দির উপর প্রয়োগ করা হতো। এমনকি যাদেরকে শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তুলে আনা হয়েছে তাদের উপরও চলত অমানবিক নির্যাতন। সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হচ্ছে এইসব নির্যাতন পদ্ধতিগুলো কোন একগুয়ে অপরাধীর নিরবতা ভাঙার শেষ অবলম্বন হিসেবে ব্যবহৃত হতো না।

এগুলো প্রয়োগ করা হতো প্রথমেই। এইসব ভয়াবহতার কিছু ধারণা দেবার জন্য আমি সংক্ষেপে আপনাদের কয়েকটি বর্ণনা করব। একটি পদ্ধতি হলো একজনের হাত পিছমোড়া করে বেঁধে, তার হাটুর পিছনে একটি রড বা পাইপ রেখে, রডের সাহায্যে তাকে উপরে তোলা, একদম বরাবর যাতে সম্পূর্ণ শরীরের ভার হাটুর উপর থাকে।

একজন মানুষকে উল্টো করে ঝুলিয়ে তার পায়ের পাতায় বাড়ি মারা আরেকটি সাধারণ প্রাকটিস। ঘূর্ণায়মান পিনের মতো করে ঘূর্ণায়মান মসৃণ গোলাকার থাম আনত শরীরের উপর দিয়ে ঘোরানো নিরীহ মনে হলেও প্রচণ্ড ব্যাথার উদ্রেককারী, যারা এর মধ্য দিয়ে গেছেন তাদের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী।

সন্দেহভাজনের চোখ অন্ধকার করে ফেলা, আলো ফেলে তাকে জাগিয়ে রাখাটা একটি প্রাচীন তবে জনপ্রিয় পদ্ধতি। উত্তর প্রদেশের লোকাল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা আমাকে কারাগারে বলেছিলেন যে তিনি টানা সাতদিন ঘুমাতে পারেননি দিল্লির রেড ফোর্টের তদন্তকারীদের জন্য। একই ধরনের কাজ হচ্ছে খালি গায়ে মানুষকে তীব্র তাপমাত্রায় ফেলে দমন করা। এক্ষেত্রেও দৃশ্যমান কোনো লক্ষণ দেখা যেত না; এটা ছিল কার্যকরী, সুবিধাজনক আর পছন্দসই একটা পদ্ধতি।

কিন্তু অত্যাচার শুধু শারীরিক হওয়ার দরকার নেই। অনেকের মতে, তাদের ব্যাথার তীব্রতা বেশি হতে পারে কিন্তু বন্ধু, পরিবারের সদস্য আর তদন্ত কর্মকর্তাদের সামনে উলঙ্গ হয়ে প্রদর্শিত হওয়াটা সহ্য করা আরও কঠিন।

আল্লাহকে ধন্যবাদ যে আমাকে উপরোক্ত কোনো পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। শুধু এগুলো শুনেই আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, আমি কল্পনাই করতে পারি না যে এই অবস্থার মধ্যে পড়লে আমার কী হতো। সম্ভবত আমার তদন্তকারী, সেই নম্র ভদ্রলোক আমাকে ভয় দেখিয়ে বশে আনতে চাইছিলেন।

যাহোক, তিনি প্রসঙ্গ বদলালেন এবং আমার পাকিস্তান যাত্রার ব্যাপারে কথা বলতে চাইলেন। কাশ্মীর টাইমস এবং নিউজ পোর্টাল তেহেলকার জন্য আমার ভ্রমণ বিবরণীতে সবকিছু সুন্দর করে লেখা আছে, তবুও আমি তার জন্য সেগুলো বর্ণনা করলাম। এই ভদ্রলোক ছিলেন উচ্চতর টিমের সদস্য যারা প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর লাহোর ভ্রমণের আগেই পাকিস্তানে চলে যায়।

পরদিন, ১৩ জুন, ২০০২ তারিখে আরও দুজন তদন্তকারী তার সাথে যোগ দেন। তারা আইবির কাশ্মীর সেল থেকে এসেছিলেন। তাদের ভেতর লম্বা, তাগড়ামতো একজন ছিলেন যিনি আমার সাথে ইংরেজিতে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্পেশাল সেলের একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাকে হুমকি দিচ্ছিলেন এবং দুর্ব্যবহার করছিলেন। পাকিস্তান হাই কমিশনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে তিনি তথ্য আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। অন্য কর্মকর্তাটি আমাকে আনন্দের সাথে তার পাঞ্জাব জঙ্গিদের ব্যাপারে তদন্তের গল্পগুলো বর্ণনা করছিলেন এবং কষ্ট করে আমাকে পাঞ্জাব জঙ্গিবাদ আর কাশ্মীর জঙ্গিবাদের ব্যাখ্যা বোঝাচ্ছিলেন।

১৪ জুন, আমার সম্পাদক প্রবোধ জামওয়াল আর একজন আইনজীবী ভি.কে.ওহরি আমার সাথে দেখা করতে এলেন। কাশ্মীর টাইমস আমার মামলাটি সিরিয়াসলি নিয়েছিল। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে আমি ছিলাম নির্দোষ আর সরকারের কিছু বিভাগ থেকে আমার ব্যাপারে মিথ্যা বানানো হয়েছে। এভাবে তারা আত্মবিশ্বাসী ছিল যে আমি খুব দ্রুত মুক্তি পাব, সম্ভবত পরদিনই, যখন পাঁচদিনের পুলিশ কাস্টডির সময়সীমা শেষ হবে। তারা পেছনে চলতে থাকা চালের ব্যাপারে খুব কমই জানতেন।

কয়েকদিনের ঘটনাসমূহের ধারাবাহিকতা আর সেগুলোর প্রতিচ্ছবির অনুক্রম :

৯ জুন, দিল্লি পুলিশের কাছে আমার কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের ভেজাল মেশানো প্রিন্টআউট কপিটি জমা দেয় আইবির গোয়েন্দারা। ১০ জুন, পাঠানো দলিলের ধরন সম্পর্কে ডিজিএমআই এর মতামত জানতে চেয়ে পুলিশ প্রিন্টআউট কপিটি পাঠায়। ১২ জুন, আইবির কাছে দলিলের প্রকাশিত সংস্করণের একটি ফটোকপি হস্তান্তর করা হয়। যেহেতু তখন পর্যন্ত পুলিশ ডিজিএমআই এর কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পায়নি তাই তারা একই দিনে প্রকাশিত সংস্করণটি পাঠায়।

১৪ জুন, জিএসও ১, এমআই-৯ এর লেফ. কর্ণ. রমেশ শর্মার থেকে ইসপেক্টর রমন লাম্বা একটি চিঠি পান। এটি প্রকাশিত সংস্করণের কপি এবং দলিলের প্রিন্টআউট কপির প্রাপ্তি স্বীকার করে পাঠানো। যাহোক প্রাপ্ত মতামতে প্রকাশিত সংস্করণের কোনো উল্লেখ ছিল না, শুধু ৯ জুনের দলিলের উল্লেখ ছিল,

যেটা ছিল আমার কম্পিউটার থেকে উদ্ধারকৃত ভেজাল মেশানো সংস্করণ। চিঠিতে বলা হয়, '৯ জুন ২০০২, সৈয়দ ইফতিখার গিলানির থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের ব্যাপারে DGMO/MO3 এর মতামত আসলটির সাথে যুক্ত করে দেয়া হলো আপনার পরীক্ষা ও কাজের বিবেচনার জন্য।'

যখনই ডিজিএমআই-কে আটককৃত সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্পর্কিত কোনো দলিলের ব্যাপারে মতামত দিতে বলা হয়, তারা কয়েক সপ্তাহ পার করে, মাঝে মাঝে কয়েক মাসও লেগে যায় তাদের এ ব্যাপারে মতামত দিতে। সুস্পষ্টভাবে তাদের কিছু নিয়মকানুন মানতে হয়।

আমার মামলায়, যদিও ডিজিএমআই-কে অনুরোধ করা হয়েছিল দলিলের ব্যাপারে মতামত দিতে, সাড়া দিয়েছিলেন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশনস (ডিজিএমও)।

মনে হলো যেন আমার তদন্তকারীরা তাদের প্রশ্নোত্তর শেষ করেছে। তারা এখন শুধু কথা বলতে আর তাদের উপস্থিতি নিবন্ধন করতে আসবে। একদল লোক এসে জম্মু ও কাশ্মীরের অর্থনীতি, বার্ষিক পরিকল্পনা, ভৌগোলিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইল। আমি তাদের প্রশ্নে বিস্মিত হলাম, ভাবতে লাগলাম যে আমার মামলা নিয়ে তাদের কী কাজ। আমাকে বলা হয়েছিল যে তারা আমার তদন্তদলের লোক নয়, তারা এই তথ্য চায় কারণ তারা প্রমোশনের জন্য বিভাগীয় একটি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এবং ইনটেলিজেন্স সংস্থার জন্য জম্মু ও কাশ্মীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা আমার কাছে এসেছিল কারণ তারা জানত যে আমি দিল্লিতে কাশ্মীর বিষয়ে একটি ভালো উৎস।

ইতিমধ্যে এসিপি এল.এন রাও এসিপি রাজবির সিংয়ের কাছ থেকে মামলাটি গ্রহণ করেন। এক সন্ধ্যায় আমাকে তার রুমে নেয়া হলো। তিনি জানতে চাইলেন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক আর ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট ব্যাংকে আমার কোনো একাউন্ট আছে কিনা। আমি বললাম নেই। তারপর তারা আমাকে চোরাচালানে অভিযুক্ত করল আর বলল যে আয়কর বিভাগ আমার লকারে ৭৫০ গ্রাম স্বর্ণের অলঙ্কার পেয়েছে। আমি বললাম আমার এ ধরনের কোনো অলঙ্কারের কথা আমার জানা নেই এবং আমার একাউন্টের বিস্তারিত বর্ণনা দিলাম। আমাকে রুমে ফেরত পাঠানো হলো।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পর আমাকে আবারও তদন্তের রুমে তলব করা হল। আইবি কর্মকর্তার হাতে কিছু কাগজ ছিল। তিনি আমাকে ইমতিয়াজ বাজাজ আর জি.এম. ভাট নামের হুরিয়াট কনফারেন্স অফিসের সাবেক কোন বাহকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। এসব দলিল পরে কোর্টে উপস্থাপিত হয়েছিল কিন্তু পরে প্রত্যাহার করা হয় যখন আমরা বলেছিলাম যে এগুলো প্রমাণ করতে হবে আর সত্য প্রকাশ করতে হবে।

১৫ জুন, আমাকে দিল্লির এডিশনাল চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জে.পি.এস মালিকের সামনে উত্থাপন করা হয়। আমার আইনজীবী ওহরি আমার অভিযোগ হতে অব্যাহতি এবং মুক্তির এবং জন্য একটি আবেদনপত্র লিখেন এই মর্মে যে দলিলটি ছিল পাবলিক উৎস থেকে নেয়া আর ইন্টারনেটে এটি সহজলভ্য। তিনি দলিলের প্রকাশিত সংস্করণের একটি ফটোকপি সরবরাহ করেন। ফটোকপিতে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে যে পাকিস্তানের বিদেশ সংক্রান্ত মন্ত্রণালয় এ তথ্যের উৎস। বিচারক ক্যামেরার সামনে কার্যক্রম পরিচালনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা এই অযুহাত দেখায় যে আমরা যে দলিল জমা দিয়েছি তা প্রকাশিত সংস্করণের ফটোকপি, যে কারণে এর উপর নির্ভর করা যাবে না, সেহেতু জে.পি.এস মালিক আমাকে বিচারের কাস্টডিতে রিমান্ড প্রদান করেন আর আমার উপদেষ্টাকে আসল প্রকাশিত কপি উত্থাপন করতে বলেন। তিনি বিচারিককে ১৮ জুন ২০০২ এর মধ্যে জবাব রুজু করতে বলেন। ২ জুলাই পর্যন্ত কেস মুলতুবি রাখা হলো। আদেশ করা হলো আমাকে তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করার জন্য।

চার

তিহারের জীবন

১৮ জুন ২০০২,এক গরম, ভ্যাপসা গ্রীষ্মের দিনে তিস হাজারি কোর্টে, দিল্লি আর্মড পুলিশের তিন নাম্বার ব্যাটেলিয়নের কাছে আমাকে হস্তান্তর করা হয়। তারা বন্দিদের কারাগার থেকে কোর্টে আনা নেয়ার দায়িত্বে ন্যাস্ত। স্পেশাল সেল কর্মকর্তাদের একজন আমার হাতে একটি খাবারের প্যাকেট দেন তিহার কারাগারের বন্দিদের আনা নেয়ার কাজে ব্যবহৃত বাসে ঢুকিয়ে দেয়ার আগে। বাসটি আসলে চাকার উপরে বসানো একটি খাচা। এর মাঝে খালি জায়গা রেখে দুপাশে দুটি বেঞ্চ বসানো। কিছু বন্দি বেঞ্চে বসে আর বাকিরা মাঝের জায়গাটুকুতে দাঁড়িয়ে থাকে কোনোকিছু না ধরেই। যখন দিল্লির অসমতল রাস্তায় বাস ঝাঁকি খায় তখন হুড়মুড়িয়ে পড়ে যাওয়ার দশা হয়। দুপাশেই শেষ প্রান্তে গ্রিলের সরু দরজা। একবার বন্দিরা শেষ দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লে গ্রিলের শাটার নামিয়ে দিয়ে কঠিনভাবে আটকে দেয়া হয়। গ্রিলের বাইরে অল্প কিছু কনস্টেবল বসে থাকে।

খাবারের প্যাকেট হাতে ধরে আমি হোচট খেতে খেতে খাচায় ঢুকলাম। আমার আবার শ্বাস নেয়ার আগেই আরো বন্দি আমার উপর দুম করে এসে পড়ল। আমার কয়েক সেকেন্ড লাগল এটা বুঝতে যে তাদের নজর আমার খাবারের প্যাকেটের উপর। তাদের হামলা থেকে বাঁচতে আমি তাড়াতাড়ি সেটা ছুড়ে দিলাম। প্যাকেট ফেটে গিয়ে পুরো মেঝেতে ডাল মাখানি আর সবজি ছড়িয়ে পড়ল। আমার সঙ্গী যাত্রীরা মেঝে থেকে প্রতিটি গ্রাস প্রায় চেটে খেল। 'এক বছর হয়ে গেছে আমরা পুরোপুরি রান্না করা খাবার খেয়েছি,' একজন যাত্রী তার ঠোট চাটতে চাটতে বলল। দৃশ্যটা ছিল একইসাথে করুণ ও হাস্যকর। আমার কিছু মন্দিরের কথা মনে পড়ে গেল যেখানে বানররা ভক্তদের মিষ্টি ও প্রসাদ ছিনিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এটা কোন তীর্থযাত্রাও না, আর না আমি কোনো মন্দিরের দিকে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আমাকে তিহার আশ্রম, জ্ঞানবান মানুষজন আর তার শিষ্যদের সম্পর্কে যারা সেখানে থাকে ধারণা দেয়া হয়েছে, প্রাক্তন কারা প্রধান কিরন বেদী একে এ নামে ডাকতেই বেশি পছন্দ করেন।

খাচায় প্রায় একশত জনের মতো বন্দি ঢোকানোর পর ড্রাইভার বাস ছাড়ল। আমাকে দেখতে ভদ্র আর এ জায়গার জন্য বেখাপ্পা লাগছিল বলে একজন আমার বসার জন্য জায়গা করে দিল। শক্ত কাঠের সীটে তাদের মাঝে চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে আমি অনুভব করলাম যে আমার জনবহুল ডিআইটি বাস ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। ধীরে ধীরে আমি চারপাশে তাকালাম। অনেক যাত্রীকে পরিচিত মনে হলো। তাদের মুখে ছিল কুটিল ভঙ্গি আর রাগি ভীতি। আমি তাদেরকে বা তাদের মতো অসংখ্য চেহারা দেখেছি হিন্দি ফিল্মে। অল্প কয়েকজনকে যদিও নিষ্পাপ লাগছিল। নতুনদের শাসানো দেখে আমি বলে দিতে পারতাম যে পুরনো কারা ছিল। আমার ভিতরে ধুকপুক করতে লাগল। আমার পাশে বসা লোকটি আমার নাম জানতে চাইল। 'ও গিলানি। হুমম...তুমি তিন নাম্বার কারাগারে থাকবে,' সে আমাকে বলল। কারাগারের কাজের নিয়মের ব্যাপারে আমার প্রথম শেখাটা হলো—বন্দিদের তাদের পদবি হিসেবে বিভিন্ন কারাগারে রাখা হয়।

তিহার কেন্দ্রীয় কারাগার প্রাঙ্গণ সাতটি কারাগার নিয়ে গঠিত। এটাকে দক্ষিণ দিল্লির, দিল্লি গেট এরিয়া থেকে এর বর্তমান অবস্থান পশ্চিম দিল্লির তিহার গ্রামে স্থানান্তর করা হয় ১৯৫৮ সালে। প্রাথমিকভাবে ১২৬৮ জন বন্দির ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি কেন্দ্রীয় কারাগারের কার্যক্রম চালু হয়। কারাগারের লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে একে দু ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং যথাক্রমে ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালে এর থেকে কেন্দ্রীয় কারাগার নাম্বার-২ এবং কেন্দ্রীয় কারাগার নাম্বার-৩ চালু হয়। কারাগার নাম্বার-২ কঠোর শাস্তিপ্রাপ্ত দোষীদের জন্য নির্ধারিত। এতে কারখানা আছে যেখানে রুটি, বিস্কুট ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করা হয়। একটি নতুন ক্যাম্প কারাগার নাম্বার-৪, ১৯৭৮ সালে যাত্রা করে এবং ১৯৯০ সালে ৭৪০ জন বন্দির ধারণক্ষমতা সম্পন্ন পুরোদস্তুর কারাগার নাম্বার-৪ রূপান্তর করা হয়। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে কারাগার নাম্বার-৫ বিশেষভাবে নির্মাণ করা হয় ১৬ থেকে ২১ বছর বয়সী ৭৫০ জন বন্দির জন্য। ৩ জুন, ২০০০ সালে কেবলমাত্র মহিলাদের জন্য ৪০০ মহিলার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আরেকটি কারাগার নির্মাণ করা হয়। তিহার কারাগার প্রাঙ্গণের ছয়টি কেন্দ্রীয় কারাগারের বন্দি ধারণক্ষমতা ৩৬৩৭, যেখানে ৩১ মার্চ, ২০০৩ সাল পর্যন্ত আটক বন্দির সংখ্যা ছিল ১২,২৩২। যৌতুক চাওয়া শাশুড়ি ও ননাসের জন্য,

অসৎ ব্যবসায় গ্রেফতারকৃত মহিলা, মাদক বিক্রেতা—সাধারণত বিদেশি এবং আরও অনেকের জন্য আলাদা ওয়ার্ড বানানো হয়েছে। কারাগারে বিচারের ব্যাপ্তির কারণে, ইন্সপেক্টর জেনারেল (কারাগার) এর পদটিকে পদোন্নতি ঘটিয়ে ডিরেক্টর জেনারেল করা হয়েছে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে।

তিহার কারাগার প্রাঙ্গণের মনোরম গেটে পৌঁছাতে আমাদের প্রায় এক ঘন্টা লাগল। কারাগারের জন্য আনা বন্দিদের নামানোর পর একজন পুলিশ আমার নাম ধরে ডাকলেন এবং বললেন পরের স্টপে নামার জন্য প্রস্তুত হতে। তিন নাম্বার গেটে, আমি আরও দশ-বারোজনসহ আবদ্ধ বাস থেকে নামলাম। একটি সরু ছোট গেটের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে আমাদের এর ভেতর দিয়ে যেতে বলল। আমি সবশেষে ঢুকলাম। অন্যরা দুটি বিশাল গেটের মাঝের জায়গাটিতে সারি বেধে বসেছিল, দুই গেটের একটি দিয়ে বাইরের দুনিয়ায় যাওয়া যায় আর অন্যটি কারাগারের ওয়ার্ড ও ব্যারাকের গোলকধাঁধায় ঢোকার জন্য। এই জায়গাটি, কারাগারের প্রশাসনিক কাজকর্ম করার অংশটিকে 'দেওধি' বলা হয়। এখানকার সকল কার্যক্রম ক্লোজ-সার্কিট টেলিভিশনে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। দেয়ালে ঝুলন্ত ব্লাকবোর্ডে কারাগারে আটক বন্দিদের পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। সেখানকার কিছু টেবিল খানিকটা উঁচু ছিল যার মানে হচ্ছে কর্মকর্তাদের এখানে দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয়। হলের একদিকের বারান্দা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক, সহকারী তত্ত্বাবধায়কের আর রেকর্ড রুমের অফিসে যাওয়া যায়। বারান্দায় অন্য পাশ দিয়ে মোলাকাত রুম বা অভ্যর্থনা অর্থাৎ পরিবারের যারা দেখা করতে আসে তাদের কাছে যাওয়া যায়।

আমি প্রবেশ করেই শুনতে পেলাম কারাগারের কর্মকর্তারদের ডেস্ক থেকে আগত বন্দিদের নাম চেক করার গুনগুনানি শুনতে পেলাম।

'সে এসেছে,' এক কর্মকর্তা আরেকজনকে বলল। লোকটি ভেতরে ঢুকে গেল। দ্রুতই বের হয়ে এসে তাকে অনুসরণ করতে বললেন আমাকে। তিনি আমাকে কারাগার তত্ত্বাবধায়কের অফিসের সাথে একটি রুমে নিয়ে গেলেন। একে বলে 'বিচারাধীন' রুম।

একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক কিশান টেবিলের পেছনের একটি চেয়ারে বসে ছিলেন। দশ থেকে বারোজন রুমে ছিল। কয়েকজন ছিল কারাগারের কর্মচারী, বাকিদের মনে হলো বন্দি। কিশান আমার নাম জানতে চাইলেন। আমি

বলে শেষ করার আগেই একজন নেপালি কর্মী আমাকে থাপ্পড় মারল। এটা ছিল ইচ্ছামতো মারের শুরু। আমাকে পেছন থেকে মারা হচ্ছিল, বৃষ্টির মতো লাথি, কেউ একজন আমার চুল টেনে ধরে টেবিলে আমার মাথা ঠুকে দিতে লাগল। আমার মুখ থেকে রক্ত বের হতে শুরু করল। আমার নাক, কান দিয়েও রক্ত বের হচ্ছিল। এর সাথে ছিল বাছাইকৃত গালিগালাজ।

'শালা, গাদ্দার। পাকিস্তানি দালাল।' তারা চিৎকার করছিল। 'তোর মতো লোকদের বেঁচে থাকা উচিত না। বিশ্বাসঘাতকদের সরাসরি ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত।'

প্রায় দেড় ঘন্টার মতো আমি তাদের এই ভয়ঙ্কর দেশপ্রেমের প্রদর্শনে ভুগছিলাম যদিও কর্মকর্তারা আর বন্দিরা একে অন্যকে পরামর্শ দিচ্ছিল আমাকে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেয়ার জন্য। সবশেষে আমি জ্ঞান হারালাম। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, নিজেকে আবিষ্কার করলাম বারান্দার বাইরে, আমার মুখ বেয়ে নতুন রক্তের ধারা নেমেছে। আমাকে বলা হলো মুখ পরিষ্কার করে আসতে। গালাগালির তোড় আমাকে বাথরুম পর্যন্ত অনুসরণ করে গেল। হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল, 'পায়খানা পরিষ্কার কর।'

এ ছিল রাজেশ (পরিবর্তিত নাম), আমার অত্যাচারীদের একজন, নিজের কর্তৃত্ব দেখাচ্ছিল।

শৌচাগারটি বাস স্টেশনের পাবলিক শৌচাগারের মতোই নোংরা ছিল। আমি কিছু বলার আগেই রাজেশ নির্দেশ করল আমার রক্তেভেজা শার্ট খুলে তা দিয়ে পায়খানা পরিষ্কার করতে। তাকে মান্য করা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। পায়খানা পরিষ্কার করতে আমার প্রায় একঘণ্টা লাগল।

আমার কাজ শেষ হতে না হতেই, আরেকজন অভিযুক্ত রামু (পরিবর্তিত নাম), আমার উপর জল্লাদের মতো আবির্ভূত হলো আর আমাকে নির্দেশ দিল কিছু দূরে থাকা একটি বিরাট কুলার নিয়ে এসে রুমের কাছে স্থাপন করতে। আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কুলারটি সামান্য পরিমাণেও নড়ল না। একজন তামিলনাড়ু স্পেশাল পুলিশ (টিএনএসপি) আমার দুর্দশা দেখে বিচলিত হলো এবং নতুন কয়েকজন বন্দিকে বলল আমাকে সাহায্য করতে।

পরে আমি জেনেছিলাম যে রাজেশ ও রামু, যারা আমার তিহার কারাগারে থাকাকালে আমাকে দেশপ্রেমের পাঠ দিতে চেয়েছিল, আরও জঘন্য অপরাধে

অভিযুক্ত হয়েছিল। রাজেশের তিনটি খুনের বিচার হচ্ছিল এবং পরে আট বছরের কঠিন আটকাদেশ দেয়া হয়েছিল। রামু, একটি ধর্ষণ মামলায় বিচারাধীন ছিল এবং পরে দণ্ডিত হয়েছিল।

এখন বারান্দাটি ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা শুরুর অপেক্ষায় মেঝেতে বসে থাকা নতুন বন্দিদের ভিড়ে ভর্তি। সাথের রুমটি ছিল খোলা। আমাকে আবার তলব করা হলো আর ভিতরের চেয়ার, টেবিল আর রুমটি পরিষ্কার করতে বলা হলো। আমি সন্দেহাতীতভাবে আদেশ মানলাম।

ভর্তির কাজকর্ম শুরু হলো। একের পর এক নতুন বন্দিদের ভেতরে ডাকা হলো। একজন কারা কর্মকর্তা এবং একজন ডাক্তার কয়েকজন বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কয়েদীর সাহায্যে কাজটি করছিল।

সুস্পষ্টভাবে রাজেশ আর রামু ছিল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের দলে। রাজেশ ছিল ডাক্তারের সাথে। যখন সে আমার নাম আর শনাক্তকরণ চিহ্ন রেকর্ড করছিল, সে মৌখিক ও শারীরিক গালাগালির তুবড়ি ছুটিয়ে দিল। ডাক্তার আমার অপরাধ জানতে চাইল। যখন তাকে বলা হলো, সেও আমাকে মারল।

যাইহোক, একজন মেডিকেল প্রাকটিশনার হিসেবে, কোনো প্রত্যেক নতুন বন্দিকে আগাগোড়া চিকিৎসা করা আর কোনো আঘাত আছে কিনা তা দেখাই তার সেখানে থাকার কারণ। তিনি আমাকে লিখতে বললেন যে, কারাগারে যে আঘাত করা হয়েছে সেগুলো আসলে পুলিশের দ্বারা হয়েছে যখন আমি তাদের জিম্মায় ছিলাম। তিনি অবাক হলেন যে আমার মতো একজন বিশ্বাসঘাতককে এত সহজে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো আমি সাহস অর্জন করলাম আর প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানালাম।

ডাক্তার তার আদেশ মানতে আমাকে বাধ্য করেননি। আমি বুঝতে পারলাম যে তিনি আমাকে রাজেশ, রামু আর তাদের সঙ্গিদের হাতে তুলে দেয়ার চেয়ে আর কোন খারাবি করতে পারবেন না।

'তোর শার্ট কই,' রামু জানতে চাইল।

'শৌচাগারে,' আমি বললাম।

'যা ওটা নিয়ে যেভাবে আছে সেভাবেই পড়,' সে আদেশ করল।

শার্টটি এত নোংরা ছিল যে আমার প্রায় বমি চলে আসছিল। কিন্তু আমি পরের তিনদিন সেটা পড়ে থাকতে বাধ্য হলাম। দিল্লির জুন মাসের ভ্যাপসা গরমেও।

দৃশ্যত এ ধরনের শাস্তি তাদের দেয়া হয় যারা কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ককে ধর্ষণ করেছে বলে বোঝা যায় বা অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট এর অধীনে কোনো অপরাধ করে।

কারাগারে ঢোকার আগে চূড়ান্ত অসম্মান আর অমর্যাদার একটা আয়োজন ছিল। অন্য বন্দিদের সাথে আমাকেও নগ্ন হতে হয়েছিল। তিহার স্পেশাল পুলিশ (টিএসপি) এর কর্মচারীরা শরীরের প্রতিটি অঙ্গ কঠিনভাবে খুজে দেখে যে কারও সাথে কোনো তামাক, মাদক বা নিষিদ্ধ কিছু লুকানো আছে কিনা। এই পরীক্ষাটি প্রতিবার যখন করা হয় কোন বন্দি বাইরে থেকে আসে, সে মুলাকাত রুম বা কোর্ট থেকেই আসুক না কেন।

সাধারণত প্রত্যেক নতুন প্রবেশকারীকে একরাতের জন্য হলেও মুলাহিজা ওয়ার্ডে পাঠানো হয়, তার জন্য নির্ধারিত ওয়ার্ডে যাওয়ার আগে।এটা নির্ভর করে বন্দির প্রথমবার আসা বা পুনরায় আসার উপর।

'সর্বোচ্চ-নিরাপত্তা' ওয়ার্ডকে কারাগারে 'হাইলাইট' বলা হয়। বন্দিকে তেইশ ঘন্টা আটকে রাখা হয় আর কারও সাথে যোগাযোগ করতে দেয়া হয় না। তাকে দিনে শুধু এক ঘন্টা বারান্দায় হাটতে দেয়া হয়।

কারা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আমি ছিলাম একজন কড়া অপরাধী। তাই আমাকে সোজা সর্বোচ্চ-নিরাপত্তা ওয়ার্ডে নেয়া হল। সাদা শার্ট ও ট্রাউজার পরিহিত, পত্রিকা হাতে এক অপরাধী ওয়ার্ড ইন-চার্জকে বলল আমাকে একা বন্দি করে রাখতে।

'আমি আলাদা সেল কোথায় পাব? এরমধ্যেই আমার পঁচিশজন বন্দি আছে,' ইন-চার্জ অভিযোগ করলেন। ইন-চার্জ আর অপরাধীর মধ্যে বাগবিতণ্ডা চলল। আমাকে দুজন টিএসপি কর্মচারী গার্ডের জিম্মায় রেখে তারা দুজন কারা অফিসে গেল। কিছুক্ষণ পরে ইন-চার্জ ফিরে এল।

আমার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে, সে চিবিয়ে বলল, 'আপনি একজন বিপজ্জনক বন্দি। সে আমাকে গোলমেলে বারান্দা দিয়ে হাটিয়ে, অসংখ্য দরজা

খুলে 'কাল কুঠুরি' বা 'মৃত্যু সেল' এ নিয়ে এল। এ জায়গাটা তাদের জন্য যারা ফাঁসির অপেক্ষায় আছে।

আমাকে আট ফিট বাই ছয় ফিট একটা সেলে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ধুলার পুরু একটা স্তর ছাড়া রুমটা ছিল একদম খালি। এর মধ্যে সম্ভবত বছরখানেক কোন বন্দি রাখা হয়নি। এর সাথে লাগোয়া একটি নোংরা শৌচাগার ছিল যার কোন দরজা বা পর্দা ছিল না। আমার জন্য বারান্দায় এক ঘন্টা হাটার বিলাসিতারও অনুমতি ছিল না। পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে একা ছিলাম আমি। অন্য কোন বন্দির চেহারা দেখতে বা কণ্ঠস্বর শুনতে পাইনি। কোনো কিছু লেখার, পড়ার বা কারো সাথে কথা বলতে পারিনি। সামাজিকীকরণ আর সাহচর্যের সত্যিকার অর্থ সহজাতভাবে বুঝে এল আমার আর উপলব্ধি করলাম মানুষের অনুপস্থিতির চেয়ে অমানবিক আর কিছু নেই।

কিছু সেল পরেই ছিলেন প্রফেসর দেবিন্দ্রপাল সিং ভুল্লার, টাডা কোর্টের মৃত্যদন্ডাদেশ পেয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন। ১৯৯৫ সালের ১৮ই জানুয়ারি প্রফেসর ভুল্লার জার্মানি থেকে ভারতে নির্বাসিত হন। তাকে ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দরে আটক করা হয় এবং সরকার ও টাডার দুটি দলিল বিকৃতকরণের অভিযোগ আনা হয়। জানুয়ারি ১৯৯৫ তে তাকে দুই মাসের জন্য পাঞ্জাব পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। যখন ১৯৯৫ এর মার্চ মাসে তাকে কাস্টডিতে ফিরিয়ে আনা হয়, তিনি একটি অভিযোগ দাখিল করেন এই মর্মে যে তাকে শারীরিক নির্যাতন ও ফাঁসির ভয় দেখানো হয়েছিল যদি তিনি কতগুলো সাদা কাগজে স্বাক্ষর না করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে স্বাক্ষরিত এসব সাদা কাগজ পরে পাঞ্জাব পুলিশ তার স্বীকারোক্তিকে বিকৃত করার কাজে ব্যাবহার করেছিল।

একটি ডেজিগনেটেড কোর্ট (স্পেশাল কোর্ট এনেক্টেড আন্ডার টাডা) কর্তৃক আগস্ট ২০০১ সালে প্রফেসর ভুল্লারকে মৃত্যদন্ডাদেশ দেয়া হয়। তিনি পরে ইন্ডিয়ার সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল করেন। তিন বিচারকের একটি বেঞ্চ এপ্রিল ২০০২ সালে তার আবেদন শোনে যেটা দুই বা একজনে শাসিত লোয়ার কোর্টকে সমর্থন করে। বেশিরভাগ বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় যেখানে ভিন্নমত পোষণকারী বিচারে তাকে খালাস দেয়া হয়। কমসংখ্যক বিচারে

বলা হয় প্রফেসর ভুল্লারের তাদের সামনে যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়ার কথা ছিল তা পুলিশ নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে।

যতক্ষণে সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে আমি আমার সেলে স্থির হয়েছিলাম ততক্ষণে অনেক দেরি হয় গিয়েছিল। বন্দিদের রাতের খাবার দেয়া হয়ে গিয়েছিল আর আমাকে না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। ঘুম তো বহু দূরের কথা। আমি এখনও বিশ্বাস করি যে এটা ছিল একটা বাজে স্বপ্ন আর আমি যেকোনো সময় জেগে উঠব, সব শেষ হয়ে যাবে আর ঠিক হয়ে যাবে। আমি আমাকে এই ব্লকে বন্দি রাখার পক্ষে কোনো যুক্তি খুজে পাই না কারণ, দিল্লি জেল ম্যানুয়াল অনুযায়ী মৃত্যদন্ডাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কোন দোষীকে এখানে রাখা যাবে না।

আমার সেলের বাইরে একটি উজ্জ্বল আলোকিত বারান্দা ছিল। শেষ প্রান্তে ছিল একজন প্রহরী। বারান্দার অন্য পাশের দরজা দিয়ে একটি ছোট লনে যাওয়া যেত যেখানে ফাঁসি দেয়া হতো। কত যে দুর্ভাগা আত্মা বারান্দার এই পথ ধরে ফাঁসিকাঠে গেছে। আমি বিশ্বাস করি অনেকেই নিজের পায়ে হেটে ফাঁসিকাঠে যায়নি। তাদের টেনে নিয়ে যেতে হয়েছে। অন্যরা চেতনা হারিয়েছে। আমি দেয়ালে আবছাভাবে লেখা ফাঁসির মৃত্যদণ্ডাদেশ পরিচালনার উপর গাইডলাইন পড়েছি। যেগুলো আমার মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত বইয়ে দিয়েছে।

আমাকে পরে বলা হয়েছে যে এউ লনের এক পাশে মোহাম্মদ মকবুল ভাটের কবর রয়েছে, যিনি ছিলেন জম্মু এন্ড কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের (জেকেএলএফ) একজন কিংবদন্তি যোদ্ধা। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ সালে তাকে ওই জায়গায় ফাঁসিতে ঝোলান হয়। ফেব্রুয়ারি ২০০২ সাল পর্যন্ত তার কবরটি দৃশ্যমান ছিল আর কারাগারের কিছু কর্মকর্তা তাতে মোমবাতি জালাতো, প্রার্থনা করত। কিন্তু এখন জায়গাটিতে কিছু নির্মাণের কাজ চলছে।

পরদিন সন্ধ্যায় ওয়ার্ডার আমার সেলের দরজা খুলে আমাকে তার সাথে যেতে বললেন। আমাদের বেরিয়ে আসার আগে তাকে অনেক দরজা খুলতে ও লাগাতে হচ্ছিল। সে আমাকে দেওধিতে সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ভীনা নুকাদের অফিসে নিয়ে গেল।

'আপনি কি এস.এ.আর গিলানির কোন আত্মীয় হন যিনি সংসদ ভবনে সন্ত্রাসী হামলায় জড়িতদের একজন?' তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

'না, একদম না,' আমি বললাম।

'কিন্তু তিনি বলেছেন যে আপনি তার শ্যালক হন,' তিনি কড়াভাবে বললেন।

'আমি তাকে কখনোই দেখিনি,' আমি কঠিন স্বরে বললাম।

নুকাদ ওয়ার্ডারকে বললেন আমাকে কারা তত্ত্বাবধায়ক এ.কে কুশলের অফিসে নিয়ে যেতে। কুশল একজন লম্বা, চিকন গঠনের মানুষ। তিনি ওয়ার্ডারকে বাইরে দাড়াতে বললেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'এখন আপনার কেমন লাগছে?'

আমি তাকে ভর্তির সময় আমার উপর করা অত্যাচার আর অপমানের কথা বললাম। আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করে তাকে আমার মামলাটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম আর বোঝাতে চাইলাম যে কারা কর্তৃপক্ষ আমার সাথে যে ব্যবহার করছে আমি তার যোগ্য নই। মাথা নেড়ে তিনি বললেন, 'কিন্তু আপনি একটি মারাত্মক অপরাধ করেছেন।' আবারও আমি তাকে আমার কাছ থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের ব্যাপারে বিস্তারিত জানালাম। চিন্তিত হয়ে তিনি আমাকে রুমের বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন। সম্ভবত তিনি বুঝেছিলেন যে আমি মোটেও এমন বিপজ্জনক বন্দি নই। তিনি তার ব্যক্তিগত সহকারীকে ডেকে পাঠালেন আর তাকে কিছু নির্দেশনা দিলেন। আমাকে এবার কারা নিয়ন্ত্রণ রুম 'চক্কর' এ নিয়ে যাওয়া হলো। সকল বন্দি এই চক্করকে ভয় পায়। এখানে অবাধ্যদের নজরদারি করা হয়।

প্রবীণ সহকারী তত্ত্বাবধায়ক থমাস একজন বয়স্ক দক্ষিণ ভারতীয় লোক। তিনি নিয়ন্ত্রণ রুমে বসেছিলেন। তিনি আমার নাম ও অন্যান্য বিবরণ জেনে সেগুলো একটি রেজিস্টার খাতায় লিখলেন। তিনি একজন সৎ এবং ভদ্র ব্যক্তি আর কারাগারে আসার পর তার কাছ থেকেই আমি আমার প্রথম সদয় বাক্য শুনেছিলাম।

আমাকে একটা টিকেট দেয়া হল এবং বলা হলো যে 'এটা ঠিকমতো রাখুন। এটা কারাগারে আপনার রেশন কার্ড।' টিকিটে আমার নাম, এফআইআর নাম্বার এবং আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লেখা ছিল। আমাকে বলা হলো যে আমাকে প্রথমবার আসা বন্দিদের জন্য নির্ধারিত মুলাহিজা ওয়ার্ডে জায়গা দেয়া

হয়েছে আর সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। ওয়ার্ডের গেটে আরেকটি নিবন্ধন ছিল সেটার কলামগুলো আরও একবার যথাযথভাবে পূরণ করা হলো।

মুলাহিজা ওয়ার্ড দশটি ব্যারাক নিয়ে গঠিত। এর বর্ণিত ধারণক্ষমতা ২০০, কিন্তু যখন আমি ওখানে ছিলাম তখন প্রায় ৫০০ জন বন্দি ছিল। কোনো বন্দি এই ওয়ার্ডে ছয় মাসের বেশি থাকতে পারে না। যদি ছয় মাসের মধ্যে সে জামিনে বের না হয় তাহলে তাকে অন্য ওয়ার্ডে পাঠানো হয়।

দশটি ব্যারাকের মধ্যে দুই আর তিন নাম্বার ব্যারাক হচ্ছে নতুন আগমনকারীদের জন্য। কিরণ বেদীর মেয়াদকালে দশ নাম্বার ব্যারাকটি থিয়েটার হিসেবে ব্যাবহৃত হতো। কিন্তু এখন এর যা বাকি আছে তা হলো 'কিরণ থিয়েটার' লেখা এক ধ্বংসপ্রাপ্ত সাইনবোর্ড। এটি এখন অন্যান্য ব্যারাকের মতোই একটি ব্যারাক, ধারণক্ষমতার বাইরে। সব নতুন বন্দিদের মাঝখানে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বলা হলো। ব্যারাক প্রধান ছিল দেবেন্দ্র, ব্যাংক জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত। সে আর তার কয়েক সহযোগী আমাদের নাম ডাকছিল এক এক করে আর লিখে রাখছিল। শীঘ্রই আমার নাম ডাকা হলো। আমি সচেতন ছিলাম যে আমার নোংরা, দুর্গন্ধযুক্ত নিয়ে ঝামেলা হতে পারে। হলোও তাই।

'বদমাশ, সব জায়গায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পরিষ্কার একটা শার্ট পরতে পারিস না,' দেবেন্দ্র আর তার সহযোগীরা চিৎকার করে উঠল।

'যাইহোক, তোর নাম কী? দেবেন্দ্র জানতে চাইল।

আমি আমার বাবার নামসহ পুরো নাম বললাম।

'এত বড় একটা নাম,' বলেই সে আমার গালে থাপ্পড় দিল।

'এটা ওর দোষ না। ওর বাপ-মার দোষ,' কেউ একজন উপহাস করল আর সবাই চাপাস্বরে হাসল।

'যাহোক, কোন ধারার অধীনে তুই এখানে?' সে জানতে চাইল। আমি কার্ড দিলাম। তারা বুঝতে পারল না ওএস কী জিনিস। একজন ছোটখাটো, সুদর্শন কাশ্মীরি পন্ডিত এগিয়ে এল, কিন্তু সেও ওএস এর অর্থ বুঝতে পারল না। শেষে আমি তাদের বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। একটা ঝগড়া বেধে গেল। দৃশ্যত এটা ছিল সব গোলমালের একটা অংশ। আরও অবমাননা, আরও সহিংসতা। তাদের তামাশা শেষ হবার পর তারা আমাকে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না, তার একটা তালিকা দিল। তারপর আমাদেরকে, যারা নতুন এসেছি, তাদের বলা

হলো ঘুমানোর একটা জায়গা খুঁজে নিতে। যখন আমরা ব্যারাকে ঢুকছিলাম, আমি আলতাফ ওয়ানিকে দেখলাম, সেই কাশ্মীরি শাল বিক্রেতা যে আমার সাথে স্পেশাল সেলে ছিল। সে আমার জন্য কিছু জায়গা করে দিল। আমার জন্য তার উদ্বেগ আমাকে স্পর্শ করল। ঘুমিয়ে যাবার আগে আমি কারাগারের দেয়ালে সজ্জিত একঘেয়ে বাদামি শ্লোক, কবিতার লাইন, আর উদ্ধৃতি নিয়ে ভাবতে লাগলাম। যদিও সেগুলো মানুষের জীবনে দয়া, সেবার অনুভূতি আর শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে, কারও মর্যাদা, আত্মসম্মান আর ব্যক্তিত্ববোধ তাদের দ্বারা প্রতিনিয়ত লঙ্ঘিত হয় যাদের কথা ছিল এগুলোকে তুলে ধরা।

পরদিন, ২০ জুন ২০০২, সব বন্দিরা ওয়ার্ডারের ডাকে ৫:৩০ এ জেগে উঠল। সে চিৎকার করছিল, 'উঠো, উঠো। এভাবেই আমার পরবর্তী সাত মাসের দিন শুরু হতো। বন্দিদের শাস্তি দিতে ওয়ার্ডার যেন ধর্ষকামী আনন্দ খুঁজে পেত। সে আমাদের না ডেকে চুপিচুপি সেলে ঢুকে পড়ত। এরপর যদি তখনও কাউকে ঘুমাতে দেখত তাহলে তার বাকি দিনটা নরক বানিয়ে ফেলত। অগত্যা আমি একজন ভোরে ওঠা ব্যক্তি হয়ে গেলাম।

আমাদের সকালের হাতপা ধোয়া হয়ে গেলে, মাঠে একত্র করা হতো প্রার্থনা করার জন্য। এটা ছিল বিখ্যাত ভি. শান্তারাম মুভি ডু আঙ্খেন বারাহ হাত এর একটি গান। মুভিটি কারা সংশোধনের বিষয়ে নির্মিত। যদিও তিহার কারা কর্তৃপক্ষ প্রতিদিন প্রার্থনার উপর জোর দেয়, প্রার্থনার বার্তা তদের চিন্তাভাবনা আর কাজকে পরিস্রুত করে বলে মনে হয় না। তারা বন্দিদের উপর কড়া নজরদারি করত আর যদি কোনো বন্দি ধর্মীয় আনুকূল্য চাইত, তার জন্য ভয়ানক শাস্তির ব্যবস্থা হতো।

গানটির কথা হলো গডের কাছে সাহায্য চাওয়া, যেন আমরা, তার সৃষ্টিরা, সঠিক পথে চলতে পারি, ভালো কাজ করতে পারি, আর খারাপ থেকে দূরে থাকতে পারি। যেন আমাদের আত্মা যখন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে তখন আমরা শান্তি পাই। এই গান গাওয়ার প্রথাটি চালু করেছিল কিরণ বেদী, সেই উৎসাহী কারা প্রধান, যিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন কারাগারের নিয়ম আর বন্দিদের জীবনে কিছু সংশোধন নিয়ে আসতে। এখন গানটি শাস্তির আরেক রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমাদেরকে কারাগারের বেকারিতে তৈরি দুই টুকরা রুটি আর বাজেভাবে তৈরি এক গ্লাস চা দেয়া হয়। রাতের খাবার না খাওয়ায় মারাত্মক ক্ষুধা ছিল, তবু আমি রুটি বা চা কোনোটিই খেতে পারলাম না—এতটা খারাপ ছিল সেগুলোর অবস্থা। একদম মনমরা হয়ে আমি আঙিনার একটি গাছের চারপাশে বাঁধানো চত্বরে বসলাম। একজন চিকন, লম্বা, মধ্যবয়সী লোক আমার কাছে এলেন। তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন যে, আমিই সেই ইফতিখার কিনা যাকে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট এর অধীনে গ্রেফতার করা হয়েছে? আমি হ্যাঁ বাচক উত্তর দিলাম। তিনি নিজেকে ওয়াসি আখতার জাইদি নামে পরিচয় দিলেন যিনি ওএস অ্যাক্ট লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত। আরও অনেক বন্দি আমার চারপাশে জড়ো হলো। তারা আমাকে টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলে দেখেছে এবং তারা আমার দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু, কিছু পরেই, ব্যাখ্যাতীতভাবে, টেলিভিশন চ্যানেলগুলো টেলিভিশন নেটওয়ার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ওয়াসি আখতার আমাকে কারাগারের ক্যান্টিন থেকে চা অফার করলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে আমি কোন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি কিনা। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমাকে অন্য কোন ব্যারাকে বদলি করা সম্ভব কিনা যেহেতু আমি এখানে যথেষ্ট ভোগান্তি আর অমানবিকতার স্বীকার হচ্ছি। বন্দিরা ওয়ার্ডের মুন্সীর উপর প্রভাব খাটিয়ে আমাকে ব্যারাক নাম্বার-৩ এ স্থানান্তর করল। যাহোক পরিস্থিতি এখানেও ভালো হলো না। আমার পৌঁছানোর পরই আমাকে শৌচাগার পরিষ্কার করতে বলা হলো। এটা করার পর আমি একটু ঘুমাতে চাইলাম। হঠাৎ করে একজন বন্দি, নিতিন পান্ডা (পরিবর্তিত নাম) আমার কানে ঘুষি মেরে আমাকে ঘুম থেকে ওঠাল। সে আমার চেহারায় একবার তাকাল, তারপর জানতে চাইল যে আমি কি সেই কাশ্মীরি যাকে মালভিয়া নগর থেকে একটি আয়কর অভিযান চলাকালে গ্রেফতার করা হয়েছে? ওহ, না। এবার কী, আমি ভাবলাম। দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে আমি মাথা নাড়লাম। তার প্রতিক্রিয়া বিরক্তিকর ছিল না। সে কিছুটা নরম হলো এবং আমাকে অন্য বন্দিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর আমাকে প্রধানের কাছে নিয়ে গেল। সে প্রধান ও তার সহযোগী আর অন্য বন্দিদের বলল আমার ভালো করে দেখাশোনা করতে আর কোন হয়রানি না করতে। বন্দিদের ব্যবহার নাটকীয়তভাবে বদলে গেল। তারা আমাকে ব্যাপক

সম্মান দেখাল আর আমাকে ব্যারাকে কোনো কাজ করতে দিল না। আমি স্তম্ভিত হলাম।

অনেক পরে আমি জেনেছিলাম যে একজন প্রভাবশালী বন্দি আমাকে যেদিন আনা হয় সেদিন ছাড়া পেয়েছিলেন, তিনি সাবধান করে গিয়েছিলেন আমাকে যখন কারাগারে আনা হবে তখন যেন কোনো হয়রানি না করা হয়।ব্যারাকে নামানো টেলিভিশনে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমার নাম জেনে আর তিহারের থাকার সিস্টেম জেনে এই মানুষগুলো আগেই বুঝেছিলেন যে আমাকে এই ওয়ার্ডে আনা হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বন্দিদের রাখা হয় তাদের পদবি অনুযায়ী। শ্রেণিবিন্যাস পদ্ধতি খুব মজার এবং অর্থবহ।

কারাগার নং ১—সকল বন্দি যাদের পদবি শুরু এস এবং টি দিয়ে, রক্তের আত্মীয়, মাদকাসক্ত

কারাগার নং ২—সকল অভিযুক্ত

কারাগার নং ৩—সকল বন্দি যাদের পদবি শুরু এ বি সি ডি ই জি এইচ আই এল ভি ডব্লিউ দিয়ে। কারাগারে এবং ওয়ার্ডের সকল অসুস্থ বন্দি এখানে কারা হাসপাতালে ভর্তি থাকে।

কারাগার নং ৪—সকল বন্দি যাদের পদবি শুরু হয় এফ জে কে এম এন ও পি কিউ আর ইউ এক্স ওয়াই এবং জেড দিয়ে।

কারাগার নং ৫—যাদের বয়স আঠারো থেকে বিশের মধ্যে।

কারাগার নং ৬—সকল মহিলা বন্দি/অভিযুক্ত/বিচারাধীন।

তিহার কেন্দ্রীয় কারাগার নাম্বার-৩ এ বারোটি ওয়ার্ড রয়েছে। একটি ওয়ার্ড হচ্ছে কারাগারের উঁচু দেয়ালঘেরা একটি অংশ। কিছুসংখ্যক ব্যারাক নিয়ে এটি গঠিত যেখানে বন্দিরা থাকে। প্রতিটি ব্যারাক শয়নাগারের মতো এবং বন্দিদের সংখ্যা সাধারণত তিরিশ থেকে ষাটের মতো হয়, নির্ভর করে এর আকার এবং ধারণক্ষমতার উপর। প্রতিটি ব্যারাকের তিনদিকে দেয়াল আছে যেগুলোয় শক্ত গ্রিলে উঁচুতে বসানো জানালা আছে। চতুর্থ পাশে পুরোপুরি গ্রিল দিয়ে ঘেরা যেটাতে একটি ছোট লোহার হুড়কো দেয়া গেট আছে। টহলদার কারা কর্মকর্তারা এখান দিয়ে পুরো ব্যারাকের দৃশ্য দেখতে পায়। যাহোক এটা খোলা হওয়ার কারণে বন্দিরা আবহাওয়ার খেয়ালে পড়ে। লকআপ সময়ে যেখানে সাধারণভাবে

একটি বাথরুম-কাম-ল্যাট্রিন ছিল, সেখানে ব্যারাকে কয়েকটি ফ্যান আর টেলিভিশন সেট আছে। ব্যারাকে হিন্দু দেব-দেবির মূর্তিসহ একটি ছোট মন্দিরও আছে। যেখানে ওয়ার্ড নং ১ আর ২ মূলত অভিযুক্তদের জন্য, ওয়ার্ড নং ২ এর একটি ব্লক আছে অবাধ্য বিচারাধীনদের শাস্তির জন্য। তারা একদম একাকী আটকানো থাকে কিন্তু কাসুরীদের জন্য ওয়ার্ড নং ৩ ও ৪ এ কারা হাসপাতালে বিখ্যাত ও ভয়ঙ্কর বিশ নাম্বার সেলে পাঠানোটা সাধারণ ব্যাপার। এই সেলগুলো পুরোপুরি নির্জন এবং মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত বন্দিদের আবাস।

৫ আর ৬ নাম্বার ওয়ার্ডে থাকে রিপিটার আর অন্যরা যারা ছয় মাসের বেশি সময় ধরে কারাগারে আছে। ৭ নাম্বারে থাকে মানসিক রোগী আর মাদকাসক্তরা। ৮ নাম্বার 'উচ্চ-নিরাপত্তা' ওয়ার্ড। ৯ নাম্বার তাদের জন্য যারা ধ্যান করতে চায়। ১০ নাম্বারের মুলাহিজা ওয়ার্ড প্রথমবার আসা ছয় মাসের বন্দিদের জন্য। ১১ কে বলা হয় আইজিএনওইউ ওয়ার্ড। এর মধ্যে ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি আর ন্যাশনাল ওপেন স্কুল এর তত্ত্বধানে এতে একটি স্টাডি সেন্টার আছে। ১২ নাম্বার হচ্ছে ৭ নাম্বার ওয়ার্ড আর হাসপাতাল বাদে পুরো কারাগারের জন্য লঙ্গরখানা অর্থাৎ রান্নাঘর, ৭ নাম্বার আর হাসপাতালে আলাদা রান্নাঘর আছে।

কিরণ বেদি কারাগারের শ্রেণি বৈষম্য দূর করেছেন। বাইরে থেকে কারাগারকে সমঅধিকারের জায়গা বলে মনে হলেও, প্রশাসনের ভেতরে ফাঁকফোকর আছে। পয়সাওয়ালা আর ক্ষমতাবানদের আরামের ব্যবস্থা করা সহজ। এ ধরনের লোকেরা সাধারণত আইজিএনওইউ এবং সাত নাম্বার ওয়ার্ডে তাদের পথ বের করে নেয়, যেগুলো উঁচু আর ক্ষমতাবানদের আলাদা সেল, মাদকাসক্তদের সেবাসহ। তাছাড়া এর আলাদা রান্নাঘর আছে যেখান থেকে তারা ভালো খাবার পেতে পারে

আমি দেখেছি, তিহার কারাগারে জাতিগত বৈষম্য তীব্র। বিদেশিদের, বিশেষ করে ইউরোপিয়ানদের সাথে ভারতীয় বন্দিদের চেয়ে ভালো ব্যবহার করা হয় কারণ তাদের খরচ করার মতো টাকা আছে। বেশিরভাগ বিদেশিদের আমি দেখেছিলাম নারকোটিকস ড্রাগস এন্ড সাইকোপ্যাথিক সাবস্টেন্স অ্যাক্ট (NDPS act) এর অধীনে মাদক কেনাবেচার অভিযোগে অভিযুক্ত। তারা রুটি এবং দুধ পেত যেগুলো স্থানীয় বন্দিদের জন্য নিষেধ ছিল। তারা দিনের বেলায় আটক

থাকত আর রাতে কারা প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াত। সাধারণত তাদের আইজিএনওইউ ওয়ার্ডে আটকে রাখা হত। তাদের কেউ কেউ আলাদা সেলের ব্যবস্থাও করে ফেলেছিল।

যেহেতু আমি কোনো বিদেশিও ছিলাম না, কোনো ধনী বা ক্ষমতাবান ব্যক্তিও ছিলাম না, তাই আমাকে সাধারণ বন্দিদের সাথে রাখা হয়েছিল। ব্যারাক নাম্বার ৩ এর বন্দিরা আমার সাথে এত ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে, যখন নতুন বন্দিরা ভর্তি হয়ে আসত তখন আমার অন্য ব্যারাকের ভর্তি স্থগিত করে দিত। তারা এ পদ্ধতি ভালো করেই জানত।

কিন্তু আমার ঝামেলা শেষ হয়নি। আমি শুধুমাত্র ব্যারাকের ভেতরে হয়রানি থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম, যখন ব্যারাকগুলো খোলা হতো, আমার হয়রানি পুরোদমে শুরু হতো। আমাকে কমন শৌচাগার পরিষ্কার করতে হতো, ওয়ার্ডের কমন অংশ এবং মেঝে ঝাড়ু দিতে ও মুছতে হতো। মনে হতো ওয়ার্ডার আর মুন্সীদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তত যন্ত্রণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া ছিল।

অলস আর অকর্মণ্য মানুষের সময় আস্তে চলে—আমার ক্ষেত্রে এই বাক্য সত্য ছিল না। প্রায় সারাদিন মুলাহিজা ওয়ার্ডে ব্যাস্ত থাকার পরও আমার কাছে মনে হতো সময় যেন একদম থেমে গেছে আর দিনগুলো যেন অশেষ। সকালে শৌচাগার, গোসলখানা আর মেঝে ঝাড়ু দিতাম, পরিষ্কার করতাম। দুপুরের খাবার খেয়ে যখন সবাই নিজেদের মতো বিশ্রাম নিত, আমি আমার কয়েকজন বন্দির সাথে কারাগারের নির্মাণাধীন একটা অংশে হাতের কাজ করতাম। চল্লিশ দিন এই রুটিন চলল। আমি আমার পুরো জীবনে এত কাজ করি নাই। নির্মাণাধীন অংশের কাজ ছিল নরকতুল্য। আমি প্রায় অবস্থার পরিহাসে পড়ে গেলাম। এখানে আমি ছিলাম একজন সাংবাদিক যে তার আঙ্গুলি চালনা করে তথ্য প্রচার করে, শিক্ষাদান করে, এবং সেভাবে মানুষকে মুক্ত করে জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। কিন্তু এখন সেই একই আঙ্গুল ব্যাবহৃত হচ্ছে শক্ত কাঠামো তৈরিতে যার কাজ হচ্ছে মানুষকে আটকে রাখা। আমার হাত কঠিন, খসখসে হয়ে গেল আর কাটাছেড়ায় ভরে গেল। আমার হাত নিশ্চয়ই এসব কাজের জন্য নয়?

কিন্তু পরিহাস কেবলমাত্র আমার দখলেই ছিল না। নির্মাণাধীন অংশে ভালো পোষাক পড়া, নতুন আগমনকারীর দেখা পেলাম। অশ্বিন কুমার (পরিবর্তিত নাম)

ছিল একজন শিক্ষিত মানুষ, একজন এয়ার ফোর্স অফিসারের ছেলে। অশ্বিন ছিলেন বারো বছর আগে অ্যান্টি-মন্ডল-কমিশন আন্দোলনে অংশ নিয়ে গ্রেফতার হওয়া ছাত্রদের একজন। তিনি সেসময় দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। অন্য ছাত্রদের মতোই তিনি অনগ্রসর শ্রেণির বর্জনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্রদের একদিন গরাদে আটকে রেখে তারপর ছেড়ে দেয়া হয়। অশ্বিন তার পড়াশোনা শেষ করতে জয়পুর চলে যান, সেখানে তিনি একটি চাকরি পান। ইতিমধ্যে অ্যান্টি-মন্ডল-কমিশনের সাথে সম্পর্কিত অনেক মামলা তুলে নেয়া হয়। অশ্বিন ভাবেন যে তার বিরুদ্ধে করা মামলাও তুলে নেয়া হয়েছে, যেহেতু তার কাছে কোনো তলব পৌঁছায়নি, তিনি কোর্টে হাজিরা দেবার ব্যাপারে মাথা ঘামাননি। একটা সুন্দর দিনে দিল্লি পুলিশের একটি দল তার বাড়ির সামনে নামে, তাকে গ্রেফতার করে আর তিহার কারাগারে বন্দি রাখে। তাকে একজন ঘোষিত অপরাধী আখ্যা দেয়া হয়। আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজকর্মের পবিত্র পদ্ধতি দেখে আমি পুরোপুরি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। অশ্বিন আমাকে বলে যে কারা জীবনের প্রথমদিকে তাকেও নিয়মিত পেটানো হতো। তার দোষ: তার শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদর্শন করা। তার সৌভাগ্য, অবশেষে তিনি মুক্তি পান।

আমার কারা জীবনের তৃতীয় দিনেও কেউ আমাকে দেখতে আসেনি। আমার জন্য এটা কষ্টদায়ক ছিল। আমি সেই নোংরা কাপড় তিনদিন ধরে পড়ে ছিলাম কারণ বদলাবার মতো কোনো কাপড় ছিল না। শেষে আমি সমাজসেবা কর্মকর্তার কাছে গেলাম, যার দায়িত্ব ছিল বন্দিদের দেখাশোনা করা, তাদের পরামর্শ দেয়া আর তাদের পরিবারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। আমি তাকে বললাম যে আমি চিন্তিত কারণ কেউই এমনকি আমার স্ত্রীও আমাকে দেখতে আসেননি। অফিসার সঞ্জয় কুমার আমাকে বললেন, আমার মুলাকাতের কথা ভুলে যাওয়া উচিত। 'আপনার স্ত্রীকেও গ্রেফতার করা হয়েছে', তিনি ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি পুরো হতাশা আর অসহায়ত্বে ডুবে পাথর হয়ে গেলাম। আনিসার চেহারা তীব্রভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি অনুভব করলাম যদি আমার হাত বের করতে পারতাম তাহলে তা স্পর্শ করতে পারতাম। তার চেহারায় বিবর্ণ, উদ্বিগ্ন একটা অভিব্যক্তি। আমি স্মরণ করলাম স্পেশাল সেল আর কোর্টের দিনগুলো যখন সে

অমোঘ নিয়মানুবর্তিতায় আমাকে দেখতে আসত। কিন্তু যেদিন আমাকে বিচারের কাস্টডিতে প্রেরণ করা হয় সেদিন সে কোর্টে উপস্থিত ছিল না। এটাই সমাজসেবা কর্মকর্তার বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্য করে। হঠাৎ করে আমি আমার পরিস্থিতি দেখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। আমার অবস্থা এখন আর কোনো ব্যাপার না। আনিসার কারাগারে থাকার চিন্তা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

আমি চারপাশে তাকালাম। ব্যারাকের কোলাহল আর উচ্চ আওয়াজের মাঝে থেকেও একাকীত্বের মৃতবৎ নীরবতায় ডুবে গেলাম। এ যেন পথের শেষ। দুঃখ আর ব্যাথার পানে চেয়ে থাকা। হঠাৎ আমার স্ত্রীর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা আমার সামনে ভেসে উঠল। সে আমার ব্যারাকে এসেছে, সকল বাধা পেরিয়ে। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে তাকে কি বলব। সেও কিছু বলল না। কিন্তু একঝলকের জন্য তার হাসিমুখ আমার উপর অবর্ণনীয় প্রভাব ফেলল। সে আমার সাথে ছিল না সেটা কোনো ব্যাপার না। আমি কোথায় বসে ছিলাম আর কী ভাবছিলাম সেটাও কোনো ব্যাপার না। কষ্ট দূর হয়ে গেল। একটা গভীর প্রশান্তি আমার ভেতর প্রবেশ করল। আমি আমার দুর্ভাগা অবস্থার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলে যেতে পেরেছিলাম। ঠিক তখন, একজন অভিযুক্ত মুন্সী, হরি সিং আমার কাছে এল আর আমাকে পঞ্চাশ রুপি সমমূল্যের একটি কুপন দিল। ‘থমাস সাহেব এটা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি মুলাকাত রেজিস্টার থেকে দেখেছেন যে আপনার বাড়ি থেকে কেউ আপনাকে দেখতে আসেনি, আর তাই... সে একনাগাড়ে বলল’। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক থমাসের কাছ থেকে পাওয়া এই দয়ালু আচরণ ছিল অপ্রত্যাশিত। আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করল। আমাদের অন্ধকার পৃথিবীতে তার মতো লোকেরা সূর্যের আলোকরশ্মির মতো, নিয়মের তীব্র পচন সত্ত্বেও, কিছু মানুষ মানবিকতার সহজাত সত্ত্বাকে ধরে রেখেছে, এ যেন তারই ছোট কিন্তু নিশ্চিত যোগসূত্র। থমাসের কাছ থেকে পাওয়া এই উপহার ছিল সময়োচিত আর উপযুক্ত। সে সময় আমার কাছে এক পয়সাও ছিল না। প্রথমবারের মতো আমি উপলব্ধি করলাম পঞ্চাশ রুপি কতটা মূল্যবান।

যেহেতু অর্থ আর দামি জিনিস কারাগারের ভেতর নিষিদ্ধ, কারাগারে বেচাকেনা চলে কুপন দিয়ে। মুলাকাতের সময়ে আত্মীয়রা বন্দিদের ৫০০ রুপি সমমূল্যের কুপন দিতে পারে। এই কুপন দিয়ে বিভিন্ন উপায়ে বন্দিরা চা, সাবান, বালতির মতো প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে। প্রচলিত মুদ্রার উপর

নিষেধাজ্ঞার কারণে কারাগারে এক ধরনের ব্ল্যাক মার্কেটের উদ্ভব ঘটেছে। যদি কেউ গান্ধি নামে অভিহিত একটি ৫০০ রুপির নোট পাচার করতে পারে তাহলে সে সেটি দিয়ে ৭৫০ সমমূল্যের কুপন কিনতে পারবে। কিন্তু সেদিনের ৫০০ রুপির নোট সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে এর হার বদলায়।

গান্ধি দিয়ে বিভিন্ন কাজ করা হয়। এগুলো হাতের তালুতে চর্বি জমায় আর নিষিদ্ধ বস্তু যেমন তামাক, মাদক, অ্যালকোহলসহ আরও অন্যান্য জিনিস আমদানি করে। তামাক কারাগারে নিষিদ্ধ বস্তু, কাজেই সিগারেট আর তামাকের থলি পাচার করা সবচেয়ে লাভজনক। বাজারের ২০ রুপির তামাকের থলি ৪০০ রুপিতে বিক্রি করা যায়। একটামাত্র বিড়ি তিহারের ভেতর ত্রিশ রুপি।

সেই সন্ধ্যায় একজন মুন্সী আমার নাম ধরে ডাকলেন আর আমাকে তার সাথে দেওধিতে যেতে বলল। সে আমাকে বলল যে, আমার স্ত্রী এসেছে। আমাকে মুলাকাত রুমে নিয়ে গেল। তখন বিকেল ৪টা বাজে। এ সময়টা সাধারণত 'হাই প্রোফাইল' বন্দিদের মুলাকাতের সময়। মুলাকাত রুমে ইত্যবসরে তিনজন বন্দি ছিল। মাত্র কয়েকদিন আগেই আনিসাকে দেখেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন জনমভর। সমাজসেবা কর্মকর্তা আমাকে আনিসার গ্রেফতারের কথা বলার পর আমি ওকে স্বপ্নে দেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমাকে দেখতে আসার চিন্তা তো দূরের বিষয়। আমি আনিসাকে দেখলাম। ক্লান্ত আর বিবর্ণ লাগছিল। তার চেহারায় ধকল আর উদ্বেগের চিহ্ন। আমাকে এই অবস্থায় দেখাটা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। কিন্তু তার চেহারা দেখা মাত্রই স্বস্তি আর দুঃখ আমাকে কঠিনভাবে আঘাত করল, আমি ভেঙে পড়লাম, সান্ত্বনাহীনভাবে ফুঁপিয়ে উঠলাম। এই ছিল তার সামনে আমার ফুঁপিয়ে কাঁদা। সে বিস্মিত হলো। সে বুঝতে পারছিল না যে সে কী করবে। আনিসা দ্রুতই নিজেকে সংবরণ করল আর তার সমস্ত উদ্বেগ, চিন্তাকে ভুলে জানতে চাইল কী হয়েছে। বাধার ভেতর দিয়ে আর আমার উৎপীড়কদের সতর্ক দৃষ্টির সামনে তার সাথে কথা বলাটা ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক।

ধীরস্থির হতে আমার কিছু সময় লাগল। তারপর আমি তাকে ভর্তির সময়ে ঘটা ঘটনা আর কারাগারের ভেতর আমি যে হয়রানির স্বীকার হচ্ছি তা বললাম। আনিসা কিছু বলল না। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম সে অসহায় আর নিঃস্ব বোধ করছে। আমি জানি না আমার দুর্দশার কথা তাকে বলে আমি সঠিক কাজ

করেছি কিনা। তার বাইরের জীবনও সমস্যাহীন নয়। এক এস.এ. নকভি পরিবার ছাড়া প্রায় সব প্রতিবেশী অচেনা হয়ে গেছে—তারা ভান করছে যেন চেনেই না। মিডিয়ায় প্রচারণা এমনভাবে পুরো এলাকায় ছড়িয়েছে যে তারা তাদের বাচ্চাদেরও আমার চার বছর বয়সী কন্যা আবিয়াযের সাথে মিশতে দিচ্ছে না। কিন্তু আনিসা তার অবস্থা বিস্তারিত বলল না। আমার দুর্দশাই তাকে ঘিরে ধরেছিল। ঠিক যখনই সে আমাকে বলছিল যে কীভাবে গত তিনদিন সে কারাগারে এসেছিল কিন্তু কোনো কারণ দেখানো ছাড়াই তারা তাকে ফেরত পাঠিয়েছিল, তখনই ওয়ার্ডার বলতে শুরু করল, 'সময় শেষ! সময় শেষ।' আমি অবিশ্বাস্যভাবে তাকালাম। নিশ্চিতভাবে তখনও আধাঘণ্টা শেষ হয়নি। কিন্তু সে ঠিক ছিল। একজন কারাবন্দির জন্য সবসময় তার আত্মীয় পরিজনদের দেখা সাক্ষাত চলে চোখের ইশারায়। কারাগারে থাকাকালীন, আমি শিখেছিলাম যখন ওয়ার্ডার 'সময় শেষ' বলে তখন বিস্মিত না হতে। মুলাকাত শেষ। আনিসা চলে গেল ভারী হৃদয়ে আর আমি ফিরে গেলাম দ্বিধান্বিত মনে, প্রিয় স্ত্রী ও ছোট বাচ্চাদের চিন্তা মাথায় ভীড় করে ছিল।

বেচারি আনিসা। সে কখনও দিল্লির এই অংশ দেখেনি। শুধু কারাগারে পৌঁছানোই ছিল যথেষ্ট কঠিন। তার উপর তার জন্য কষ্টকর ছিল কারা কর্তৃপক্ষের উদ্ধত আর অপমানজনক আচরণ যার সাথে তাকে যুঝতে হয়েছে।

যে রুমে মুলাকাত হয় তার কতগুলো ঘেরাও ছিল, প্রতিটি ঘেরাওয়ে তিনফুট উঁচু ইটের দেয়াল, গ্রিল আর জালসহ ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। বন্দিরা থাকে একপাশে আর মাঝখানে থাকে তাদের পৃথককারী তিনফুট উঁচু সরু জাল ও গ্রিল। কল্পনা করুন ২০০ মানুষ সেই আবদ্ধ, অল্প বাতাসযুক্ত জায়গায় একে অন্যের সাথে চিৎকার করছে। অল্প কিছু শক্তিশালী ফ্যানের বো বো আওয়াজ কোলাহল আরও বাড়িয়ে তুলছে। এই দাঙ্গার ভেতর আপনি শুধু আপনার দর্শনার্থীর অস্পষ্ট দেখা পাবেন আর কোনোরকমে শুনতে পারবেন বা আপনার কথা শোনাতে পারবেন।

প্রায়ই অনেক আবেগপ্রবণ দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। মানুষ স্বভাবতই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। তারা তীব্রভাবে কাঁদে। কিন্তু সান্ত্বনা দেয়ার কেউ নেই। তাদের পেছনে গার্ড চিৎকার করতে থাকে, 'সময় শেষ, সময় শেষ, আর মাঝে মাঝে পিটায় অথবা যারা ধীর গতিতে বিদায় নেয় তাদের শরীর টেনে

নিয়ে যায়। অভিজ্ঞতাটা বন্দি আর দর্শনার্থী উভয়ের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক। মুলাকাত রুমটায় আধুনিক প্রযুক্তি আর মানবিক সংবেদনশীলতা যুক্ত হতে পারে।

তিহার কারাগারে হাই সিকিউরিটি ওয়ার্ডে থাকার কোনো সুবিধা নেই তাই এর ক্ষতিপূরণ হচ্ছে তাদের মুলাকাত হয় সন্ধ্যার দিকে যখন দর্শনার্থীর সংখ্যা কম থাকে। যেহেতু আমি তখনও কারাগারের বইতে হাই সিকিউরিটি বন্দি হিসেবেই ছিলাম, আমারা দুই হাই সিকিউরিটি বন্দিসহ এসময়েই মুলাকাত করতাম। এটুকু দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ ছিলাম।

পরে সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে কারা তত্ত্বাবধায়ক এ.কে. কুশলের রুমে তলব করা হলো। আনিসার সাথে সাক্ষাৎ আমাকে কিছুটা আনন্দিত করেছিল যে কারণে কুশলের অফিসের বিস্ফোরণের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। তিনি আনিসার সাথে হওয়া কথোপকথনের ব্যাপারে জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম যে তার সাথে আমি আমার ভর্তির সময়ে হওয়া অত্যাচার আর চলতে থাকা হয়রানির কথা বলেছি। 'আপনার কি মনে হয় এটা একটা গেস্ট হাউজ আর আপনার সাথে সাহেবের মতো আচরণ করা হবে? এগুলো ভুলে যান। এটা কারাগার,' তিনি কর্কশভাবে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি জানতে চাইলেন ওয়ার্ডে আমার সাথে কেমন ব্যাবহার করা হয়। আমি উত্তর দিলাম যে অত্যাচার না থাকলেও অপমান আর হয়রানি আছে। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তিনি আমাকে ব্যারাকে ফেরত পাঠালেন।

করাগার থেকে বের হয়েই আনিসা ভি.কে. ওহরির সাথে যোগাযোগ করে আর আমার কাছ থেকে শোনা সবকিছু তাকে জানায়। তিনি পালাক্রমে আমার সাংবাদিক বন্ধুদের জানান যে কারাগারে আমার সাথে কী ঘটছে। পরদিন আমার তিনজন সাংবাদিক বন্ধু তিহার জেলে ছুটে আসেন কারা তত্ত্বাবধায়কের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। পরে বিকালবেলা ২০০-র মতো সাংবাদিক প্রেস ক্লাবের সামনে জড়ো হয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের অফিসের দিকে অগ্রসর হয়। তারা এতটাই রাগান্বিত ছিল যে তার রুমে জোর করে ঢুকে পড়ে। মন্ত্রী ধৈর্য সহকারে তাদের কথা শোনেন এবং তাদের সামনেই ডিরেক্টর জেনারেল (কারাগারের) অজয় আগরওয়ালকে ফোন করে তিরষ্কার করেন আর নির্দেশ দেন আমার সুরক্ষা ও নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে।

সুষমা স্বরাজের ফোন কারা প্রশাসনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর থেকে এমন কড়া ধাতানি আশা করেনি। হঠাৎ করে ওয়ার্ডগুলো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপক পরিচ্ছন্নতা শুরু হয়। প্রতিটি বন্দিকে তার আশপাশ পরিষ্কার করতে বলা হয়। কয়েকজনকে বলা হয় শৌচাগার পরিষ্কার করতে আর তাদের ব্যারাক এবং ওয়ার্ডের মেঝে পরিষ্কার করতে।

একথা ছড়িয়ে পড়ল। অজয় আগরওয়াল কারাগারে আসছেন, বিশেষ করে আমাকে দেখতে, একজন মুন্সীর কাছ থেকে আমি সেটা জানলাম। কারা কর্মকর্তারা বললেন যে এবারই প্রথমবারের মতো কোন নির্দিষ্ট বন্দির ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে ডিজি কারা পরিদর্শনে আসছেন। আমাকে সন্ধ্যায় দেওধিতে ডাকা হল। অজয় আগরওয়াল আর এ.কে.কুশল অফিসে বসে ছিলেন। আগরওয়াল সোজাসুজি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কী ব্যাপার। আমি আমার কারাগারে ভর্তির সময়ে পাওয়া অভ্যর্থনার কথা জানালাম। আমি তাকে পুরো ঘটনার বিস্তারিত বললাম, যেসব ব্যক্তি এতে জড়িত ছিল তাদের নামসহ।

তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে বললেন যে আমি গুপ্তচরবৃত্তি করে একটা মারাত্মক অপরাধ করেছি; অতএব জাতীয়তা বিরোধীরা তিহার কারাগারে থাকা অবস্থায় যা পায় সেগুলোই আমার পাওয়া উচিত।

আমি আমার মামলার ধরন তাকে ব্যাখ্যা করলাম। তাকে সহানুভূতিশীল মনে হলো এবং তিনি নিশ্চিত করলেন যে আমাকে আর এধরনের হয়রানির স্বীকার হতে হবে না। তিনি আরও বললেন যে তিনি প্রশাসনকে নির্দেশ দেবেন যেন ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট অপরাধ করায় কোওও বন্দির উপর অত্যাচার করা না হয়। আমি জানি না এমন কোনো নির্দেশ জারি করা হয়েছিল কি না।

একই দিনে, ২২ জুন ২০০২, কারা কর্মচারী আর অপরাধীসহ বিশাল এক জনতা আমার উপর ভেঙে পড়ল। সবার কৌতুহল ছিল কী ঘটছে তা জানার জন্য। ভর্তির সময়ের অত্যাচারের গল্প বলতে বলতে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম। সবাই আমার ব্যাপারে সহানুভূতিশীল ছিল। কে জানে তারা কতটা আন্তরিক ছিল। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, একজন কনস্টেবল ছাড়া আমার উৎপীড়কদের মধ্যে আর কেউ আমাকে দেখতে আসেনি। এবং সে আমাকে হুমকি দিয়েছিল যে আমি যদি বিষয়টা আরও ঘাটাই তাহলে ফলাফল মারাত্মক হবে।

কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নেয়। তারা ঘটনার বিস্তারিত জানত তবুও তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে একটা মিথ্যা প্রতিবেদন পাঠিয়ে দেয়। সেই প্রতিবেদন অনুসারে আমাকে দেওধিতে মারা হয়নি বরং ওয়ার্ডের কিছু বন্দির ভেতর ধস্তাধস্তি হয়েছে। এতে বলা হয়, আমি কারাগারে ঢুকেই চিৎকার দিয়ে উঠি 'কাশ্মীর জিন্দাবাদ' আর এতে উত্তেজিত হয়ে কিছু অপরাধী আমাকে মারে। প্রতিবেদন অনুসারে, কারা কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়। আসলে, তারা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলির পাঠা খুঁজে পায় আর আমার অভিযোগকে ব্যবহার করে সেসময় উপস্থিত না থাকা কিছু বন্দির উপর তা চাপিয়ে দেয়। তাদের একজন তখন অসুস্থ ছেলেকে দেখার জন্য প্যারোলে মুক্তি খুঁজছিল। এর কারণে তাকে মুক্তি দেয়া হয়নি। আমি আমার অভিযোগের ব্যাপারে অনুতপ্ত হলাম আর হয়রানি সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কোন নালিশ না জানানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

আমি ওয়ার্ডের হয়রানির ব্যাপারে ইচ্ছাকৃতভাবে ডিজিকে কিছু বলিনি, কারণ এর মাঝেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম যে কারাগারের কোনো ব্যক্তির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কোনো মন্ত্রী নয়, কোর্ট নয়, ডিজিও নয় বা কারা তত্ত্বাবধায়কও নয় বরং ওয়ার্ডার আর মুন্সী। মনে করুন আপনি ওয়ার্ডে বা ব্যারাকে কোনো ব্যাপারে সমস্যায় পড়েছেন, আপনার সামনে দুটি অপশন থাকবে। হয় কারাগারের সংক্ষিপ্ত বইয়ে উল্লেখিত বিশাল পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়া আর নাহয় কোন ওয়ার্ডার বা মুন্সীকে খুশি রাখা। যদি সংক্ষিপ্ত বই ফলো করতে যান তাহলে আপনার দুর্দশা আরও জটিলাকার ধারণ করার সম্ভাবনা বেশি।

অন্য এবং একমাত্র বাস্তব সমাধান হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সহকারী তত্ত্বাবধায়ক, ওয়ার্ডার, মুন্সী বা ব্যারাক প্রধানদের খুশি রাখা। এসব লোকদের সন্তুষ্ট রাখুন— যদি কেউ কারাগারে ঝামেলামুক্ত জীবনযাপন করতে চায়, অভিজ্ঞ বন্দিরা এই পরামর্শই দেয়। আমি এ নিয়ম ভঙ্গ করার চেষ্টা করিনি। আমি সবসময় তাদের কাছে ভালো হবার চেষ্টা করেছি, যদিও তাদের কাছে ভালো হবার কোনো উপায় আমার জানা ছিল না। 'আচ্ছা করনা' হচ্ছে অর্থ দেয়ার কোড। কিন্তু এর কোনো সীমা ছিল না, যেহেতু তাদের জন্য যথেষ্ট হবার মতো কোনো পরিমাণও ছিল না।

অন্যান্য কারাগারের মতোই তিহার কারাগারও জনাকীর্ণ। দিল্লি কারাগারের ম্যানুয়াল, অপরাধীদের মধ্য থেকে অপরাধী অফিসার নিয়োগ দেয়। এসব অপরাধী অফিসারদের বলা হয় মুন্সী আর সেওয়াদার। মুন্সী আর সেওয়াদারদের নিয়োগ হয় তত্ত্বাবধায়কের দ্বারা। এসব মানুষের কাজ হচ্ছে ওয়ার্ডের ভেতর টহল দেয়া, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বন্দিদের গোনা আর এধরনের কাজ যেগুলো কারা কর্তৃপক্ষ থেকে তাদের উপর বর্তায় সেগুলো করা। যাহোক, একসময় এসব অপরাধী সাধারণ বন্দিদের জন্য অতিরিক্ত-আইনি কর্তৃপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়।

একবার বন্দিরা যখন কঠিন কাজ করছিল, একজন সেওয়াদার জাহিদ (পরিবর্তিত নাম) নামের বাঙালি এক বন্দিকে পেটায় নির্মাণাধীন অংশে আলসেমি করার জন্য। ভবঘুরে বিরোধী আইনের অধীনে জাহিদকে কারাগারে পাঠানো হয়। রাগের মাথায় সে সেওয়াদারকে ইট দিয়ে আঘাত করে। সেওয়াদারের মাথায় জখম হয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হয়। নরক গুলজার হয়ে যায়। জাহিদকে সাথে সাথে ধরে চক্করে একটা চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়। তাকে নির্মমভাবে পেটানো হয় আর একাকী আবদ্ধ করে রাখা হয়। হত্যা চেষ্টার অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল কেস দেয়া হয়। ফলে তাকে কাসুরী বিবেচনা করা হয় যে কিনা অবাধ্য এবং যার 'সংশোধন' প্রয়োজন।

অপরাধী অফিসার হিসেবে নিয়োগে সুবিধা আছে। তবে তাদের মাঝেও শ্রেণিবিভাগ আছে। মুন্সীদের ভেতর যাদের প্রভাব আছে তারা ভালো পদ পায়, অন্যরা আশানুরূপ পদ পায় না। সুবিধাপ্রাপ্ত লোকেরা কারা প্রশাসনের অংশে পরিণত হয় ফলে ভালো খাবার আর মাঝে মধ্যে অর্থও জুটে।

বেআইনি অর্থ আদায়ের একটা ফিকির এসব মুন্সী আর সেওয়াদারদের মাধ্যমে চলে যারা সাধারণ বন্দিদের সরাসরি সংস্পর্শে থাকে। তারা তথাকথিত অবাধ্য বন্দিদের উপর শারীরিক শাস্তি চালায়।

যারা কারা কর্মকর্তাদের কাছে 'ভালো হবার' কোনো উপায় জানে না, তাদের পাঠানো হয় লঙ্গরখানা (যৌথ রান্নাঘরে) আর কেন্দ্রীয় কারাগার নাম্বার ২ এ যেখানে কারখানা আছে। আমার একবার লঙ্গরখানা দেখার সুযোগ হয়েছিল। লঙ্গরখানায় কাজ করা বন্দিরা খুব পরিশ্রমী। যদিও এখানে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ বেশি বন্দির খাবার রান্না করা হয়, লঙ্গরখানাটি অবিশ্বাস্যরকম পরিষ্কার। রান্না করা আর ঝাড়ুদারের পদ হচ্ছে সবচেয়ে ঘৃণিত পদ। ঝাড়ুদারের কাজকে বলা

হয় 'টাটা সুমো ড্রাইভিং', কারণ উচ্ছিষ্ট খাবার সংগ্রহের ট্রলিটা একটা টাটা সুমো। যে ব্যক্তি কারাগার থেকে খাবার সংগ্রহ করে সে তার কাছে আরোপিত ট্রলিটা আবর্জনার গর্তে নিয়ে যায়। সেখানে সে এগুলোকে পচনশীল আর অপচনশীল এ দুভাগে ভাগ করে নির্ধারিত গর্তে ফেলে।

মুন্সী আর সেওয়াদাররা কোনো বিশেষ বন্দির আচার-ব্যবহার নির্ধারণে, কোনো বিশেষ ওয়ার্ডে থাকার সুপারিশে, নিষিদ্ধ বস্তু সরবরাহ করতে এবং রাখতে ওয়ার্ডার আর সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে সহায়তা করে। এসব মুন্সীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বাইরের দর্শনার্থীদের কাছে কারাগারের একটি উজ্জ্বল চেহারা বজায় রাখতে কারা প্রশাসনকে সাহায্য করা। যেখানে সব বন্দির কাছেই কারারুদ্ধ অবস্থা দুর্দশার মতো, এসব অপরাধী অফিসাররা খুব সুবিধাভোগী কারণ তাদের আরামের পর্যায়, সেটা যাই হোক না কেন, সাধারণ বন্দিদের চেয়ে অনেক উঁচু।

তিহার কারাগারে একটা সাধারণ দিন শুরু হয় ভোর ৫:৩০। তখন সব বন্দিকে উঠিয়ে গোণা হয়। অতঃপর বন্দিদের একটি বাধ্যতামূলক প্রার্থনার জন্য তাদের ব্যারাকের সামনে উঠানে জড়ো করানো হয়। প্রার্থনা শেষ হবার পরপরই, ৬:০০ টার দিকে, মুন্সী, প্রধান আর ওয়ার্ডাররা কিছু বিচারাধীন বন্দিকে বাছাই করে ব্যারাক আর শৌচাগার ধোয়ামোছা করার জন্য।

তারপর সকালের নাস্তা দেয়া হয়। যাদের উপর কোনো কাজের ভার দেয়া হয় না সেসব বন্দিরা খোলা জায়গায় ঘন্টাখানেক ঘোরাফেরা করার অনুমতি পায়। এই সময়ে অর্থাৎ ১০:০০ টা থেকে ১২:০০ টা পর্যন্ত মুলাহিজা ওয়ার্ডে কিছু ক্লাস নেয়া হয়। উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। আসলে এসব ক্লাস কিরণ বেদীর সময়ে চালু করা আর এটা তার পুনর্গঠন কার্যক্রমের অংশ। তার পরিকল্পনা ছিল শিক্ষাদান করা আর বন্দিদের কোনো ফলদায়ক কাজে নিযুক্ত রাখা। এখন ক্লাসগুলো আসল উদ্দেশ্য থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে।

আমি গ্রাজুয়েট ক্লাসে বসতাম। এখানে কোনো নিয়মিত শিক্ষক ছিল না। বন্দিরা দাঁড়িয়ে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করত। একজন গাড়িচোর গাড়ির চাবি খোলার পদ্ধতি নিয়ে বলত। একজন অর্থ জালিয়াত বলত কীভাবে ব্যাংকের সাথে প্রতারণা করা যায়। ধর্ষণ মামলায় বিচারাধীন একজন স্বামীজি আন্ডারগ্রাজুয়েট ক্লাস নিতেন। আধ্যাত্মিক কোনো শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে, স্বামীজি

ধর্ষণ আইনে আটককৃতদের টিপস দিত আর ক্লাসে কামোদ্দীপক আমোদ জাগিয়ে তার একই অপরাধে অপরাধী ছাত্রদের অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা জানতে চাইত।

এসব পাঠের কিছু মজার মুহূর্তও আছে। একবার এক গাড়িচোর নিজের অর্জনের গর্ব করছিল, তখন একজন নতুন ভর্তি হওয়া বন্দি বলল যে তার গাড়ি, একটি হোন্ডা সিটি, কারোল বাগ, পশ্চিম দিল্লি থেকে চুরি হয়েছিল।

'সেটা কি একটা সাদা গাড়ি ছিল?' শিক্ষক জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বন্দি উৎসাহের সাথে জানাল।

'একই এলাকা থেকে একটা এস্টিমও চুরি হয়েছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' বন্দি খানিকটা বিস্মিত হলো।

'বেশ, দুঃখিত, তবে আমি দুটোকেই মাত্র দেড় লাখে বিক্রি করেছি।' শিক্ষক স্বাভাবিকভাবে বলল। ছাত্র নিজেকে ধরে রাখতে পারল না এবং শিক্ষকের দিকে দ্রুতবেগে ছুটে গেল। কেউ কোনো আঘাত পাওয়ার আগেই তাদের আলাদা করে ফেলা হলো।

আমি স্বীকার করি যে তিহার কারাগারে থাকাকালীন আমি এমন কিছু অনেক বিষয়ে জেনেছি যেগুলো হয়তো আমার ধারণাতেই আসত না: পকেটমারা, তালা সরানো—বলতে গেলে কিছু শিক্ষককে ধন্যবাদ জানাতে হয় যারা নিজের দক্ষতা প্রদর্শনে উৎসাহী ছিল। একদিন একজন পকেটমার খুব উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে খুব আপসেট ছিল যে কারা সমাজের কঠিন শাসনব্যবস্থায় পকেটমারদের মর্যাদা খুব নিচুতে। হত্যা, ডাকাতি, জোচ্চুরি, প্রতারণায় অভিযুক্তরা মইয়ের আগায় থাকে আর পকেটমার, চোররা থাকে একদম নিচুতে।

'আমরা হলাম কালাকার,' সে অভিযোগ করল। 'সুরকার, গায়ক, জাদুকরদের মতো আমাদের পেশাতেও শুধু দক্ষতা না বরং রেওয়াজ, অনুশীলনও দরকার। তাদের আর আমাদের পেশার একটাই পার্থক্য যে আমাদেরটা আইনসিদ্ধ না।' সে যেন বুঝাচ্ছিল আর যেহেতু আমি তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে কৌতুহলি ছিলাম তাই তাকে বললাম যে তাদের কিছু শিল্প শেখাতে পারবে কিনা।

'তোমাকে আমাদের গুরুজির সাথে দেখা করতে হবে' সে উত্তর দিল। গুরুজিও সেসময় কারাগারে ছিল। যাহোক সে ছিল ওয়ার্ড নাম্বার ৫ এ, যে

কারণে তার সাথে আমার কখনও দেখা হয়নি। কিন্তু কারাগারে আমার সাথে থাকা অসংখ্য পকেটমারের সাথে কথা বলে আমি টুকিটাকি মজার তথ্য জেনেছিলাম। পকেটমারা হয় দশ থেকে বারোজনের একটা দল নিয়ে যাদেরকে 'কোম্পানি' বলে। মাঝেমাঝে এর মধ্যে মহিলাও থাকে। কারাগারের ভাষায় যে পকেটমারে তাকে বলে 'মেশিন' আর তার সহযোগীকে বলা হয় 'ঠগবাজ'। যেখানে দিনশেষে লুটের মাল ভাগ করার জন্য একত্র হয় তাকে বলে 'ফুল'।

পকেটমারকে পকেট মারার সত্যিকার পদ্ধতি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, রেজর ব্লেড আর ছুরি ব্যবহার করে, চলন্ত গাড়িতে লাফ দিয়ে উঠানামা করিয়ে। তারা একটা নিয়মিত শিডিউল মেনে চলে, তাদের সবচেয়ে সক্রিয় সময় হচ্ছে মাসের প্রথম সপ্তাহে সকাল ৭:০০ টা থেকে ৯:০০ টার ভেতর আর বিকেল ৫:০০ টা থেকে রাত ৯:০০ টার ভেতর। তারা জনাকীর্ণ জায়গাগুলো যেমন বাস, মার্কেট, ব্যাংকের কাছাকাছি আর কম ব্যাস্ত এলাকাগুলোতে সমানভাবে তৎপর। যখন শিকারকে ধাক্কা দেওয়া হয় বা ময়লা ছিটিয়ে বিভ্রান্ত করা হয় তাদের বেশিরভাগ খুবই ভদ্র আর সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হয় আর একজন সঙ্গি তার থেকে ওয়ালেট বের করে নেয়। জাদুকরের মতো সবচেয়ে কার্যকরী অস্ত্র হচ্ছে বিভ্রান্ত করা। তারা জানে যে একজন মানুষের আসল মনোযোগ এক সময়ে শুধু এক জায়গায়ই থাকে আর তারা দুর্বলতার সেই সুযোগটাই নেয়। পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা শুধুমাত্র অভিব্যক্তি, চলাফেরা, আচরণ দেখেই একজন সম্ভাব্য শিকারের কথা বলে দিতে পারে। এমন অনেক কিছু আমি জেনেছিলাম।

যেটা আমি জানতাম না তা হলো পকেটমাররা একটা নির্দিষ্ট আচরণবিধি মেনে চলে। সংঘে যোগ দেয়ার নিয়ম খুব কঠিন আর একবার কেউ ঢুকলে সে আর বেরোতে পারে না। প্রত্যেক দলের মনোনীত এলাকা আছে আর সেখানে কেউ অনধিকার প্রবেশ করতে পারে না। একদিন সাপ্তাহিক বন্ধ বাধ্যতামূলক, ফলে মঙ্গলবারে তারা কাজ করে না।

পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন এবং প্রচলিত অপরাধ পকেটমারাকে কোনো গুরুতর অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। কাউকে ধরার পর তাকে যে শাস্তি দেয়া হয় সেটা তাকে শোধরানোর মতো যথেষ্ট দীর্ঘও না, আবার এত তীব্রও না যে বাধা সৃষ্টি করে। একজন বন্দি আমাকে বলেছিল যে পুলিশ তাদের দীর্ঘ সময়

কারাগারে থাকা নিশ্চিত করতে তাদের উপর অল্প মাত্রায় আঘাত ও নিবন্ধনে দেরি করে।

অনিল (পরিবর্তিত নাম) নামের একজন সুদর্শন অল্পভাষী যুবক যেকোনো ধরনের তালা খোলায় দক্ষ ছিল, ওইসব অভিনব তালাও যেগুলো নাম্বার কোড দেয়া। সে আমাকে গাড়ি চুরি করার জন্য তালা খোলার পদ্ধতি জানাল। 'নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য যাই হোক না কেন সব ধরনের তালাই খোলা যায় যদি একবার তার লিভারের কলকব্জা বোঝা যায়,' সে বলল।

'কিন্তু যেগুলোয় রিমোট লক পদ্ধতি আর এলার্ম দেয়া সেগুলো?' আমি হতভম্ব হয়ে জানতে চাইলাম।

'এটা একদমই সাধারণ। পুরো পদ্ধতিটা চলে গাড়ির ব্যাটারিতে। আমাদের কেবল ইন্ডিকেটরে সামান্য ধাক্কা আর বৈদুতিক তারে শর্ট-সার্কিট দিতে হয়। এটুকু দিয়েই এলার্ম পদ্ধতির দফারফা করা যায়,' সে ব্যাখ্যা করল।

তার মতে সেসময় গাড়ির জন্য সবচেয়ে নিশ্চিন্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল স্যাটেলাইট ট্রাকিং পদ্ধতি। যাহোক এই পদ্ধতি ভারতে সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু অনিল আত্মবিশ্বাসী ছিল যে ওই পদ্ধতি ভারতে আসতে আসতে গাড়ি চোররা উদঘাটন করে ফেলবে। 'এর উপর আর এন্ড ডি এর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে,' সে বলল।

অনিলের গল্পটা ছিল অভাবনীয়। সে ছিল একজন বুদ্ধিমান যুবক, সর্বোচ্চ চেষ্টা করেও উপযুক্ত চাকরি পেতে ব্যর্থ হয়। ফলে যখন তার এক বন্ধু তাকে এই ব্যাবসার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়, সে ভেবেছিল যত অর্থ যথেষ্ট হলে একটা ব্যবসা দাড় করানো যায় ততটা গাড়ি চুরি করে তারপর বাদ দেবে। কিন্তু তারপর, কতটুকু অর্থ যথেষ্ট? শুধুমাত্র দিল্লি কোর্টেই তার বিরুদ্ধে ত্রিশটি গাড়ি চুরির মামলা ঝুলে আছে।

একবার আমাকে এক বন্দি পরামর্শদাতার কাজ করতে ডেকেছিল। তাকে আটক করা হয় দুই বউ গ্রহণের অপরাধে। সে দুজনকেই আনন্দের সাথে সময় দিচ্ছিল। তাদের কেউই একে অন্যের অস্তিত্ব জানত না। ঘটনাক্রমে যখন তারা জানতে পারে, উভয়েই তার নামে অভিযোগ দাখিল করে। যখন তার জামিন আবেদন কোর্টের সামনে আসে, দুই বউ সেখানে উপস্থিত হয়। প্রথমে, তারা একে অন্যকে গালিগালাজ করে, তারপর যুগ্মভাবে তাকে গালিগালাজ করে এবং

তীব্রভাবে তার জামিনের অজুহাতের বিরোধিতা করে। কোর্ট সাদামাটাভাবে শুনানি মুলতবি করে।

দুই বউই বলে অন্য বউকে ছেড়ে দিতে যদি অভিযোগ উঠিয়ে নিতে চায়। সে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সে হয়তো উভয়কে সন্তুষ্ট করতে পারত না।

যখন সে তার সংকটের কথা আমাকে বলল, আমি উপদেশ দিলাম, 'তোমার দুই বউকে বলো যে তুমি তার সাথেই থাকবে যে তোমার জামিন নিশ্চিত করবে।'

বুদ্ধিতে কাজ হলো। উভয়েই তার মুক্তির প্রতিযোগিতায় নামল। লোকটি মুক্তি পেয়েছে কিন্তু বাইরে তার কপালে কী ঘটেছে আমি জানি না।

সাতবির সিং রাঠি ছিলেন দিল্লি পুলিশের একজন এসিপি, যার বিরুদ্ধে ঠান্ডা মাথায় দুজন ব্যবসায়ী, জগজিৎ সিং আর প্রদীপ গয়ালকে গুলি করার অভিযোগ আছে। তিনি ছিলেন একজন এমএ আর মানবাধিকার বিষয়ে তার ডিপ্লোমা আছে। কারাগারে তিনি মানবাধিকার বিষয়ে পিএইচডি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাতবির যখন পুলিশে কাজ করতেন তখন তাকে 'এনকাউন্টার স্পেশালিষ্ট' হিসেবে বিবেচনা করা হতো। আর এখন তিনি হতে যাচ্ছেন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ।

একজন হিজড়ার ভর্তি নিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ বিশাল ঝামেলায় পড়ে যায়। নতুন প্রবেশকারীকে তারা কোথায় রাখবে—মহিলা ওয়ার্ডে না পুরুষ ওয়ার্ডে? কারাগারে একজন অপরাধী হিজড়ার উপস্থিতি তাদের জন্য ব্যাপারটা সহজ করে দেয়। সে বলতে পারবে যে হিজড়াটি প্রবলভাবে মহিলা না পুরুষ। তার সমস্যাটা মেডিকেল থেকে সত্যায়িত করা হয়। যাহোক, তিন নাম্বার কারাগারে, পুরুষ ওয়ার্ডে বিশেষ করে ওয়ার্ড নাম্বার ৫ ও ৬ এ একজন হিজড়ার জীবন ছিল দুর্বিষহ। তিহারে পঁচিশ থেকে ত্রিশজন হিজড়া বন্দি ছিল যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল হত্যা, চাঁদাবাজি আর পতিতাবৃত্তির।

একদিন একদল শিখ শ্রমিককে মুলাহিজা ওয়ার্ডে পাঠানো হলো। তারা মস্কোতে কাজ করছিল, কিন্তু ডাবলিন থেকে ভারতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বিদেশে গিয়ে এসব লোকেরা আয়ারল্যান্ডের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ফন্দি করছিল। তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে এবং ডাবলিনে আশ্রয় চায় এই ভিত্তিতে যে তাদের রাজনৈতিক দর্শনের কারণে নিপীড়নের ভয় করছে।

তাদের ডাবলিনে একটি আশ্রয় কেন্দ্রে আটকে রাখা হয়। তদন্ত করা হয়। ভারত সরকার এরকম কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করে আর সুনিশ্চিতভাবে জানায় যে এসব লোকদের কোনো অপরাধের জন্য খোঁজা হয়নি। আইরিশ কর্তৃপক্ষ বত্রিশ দিন পর তাদের ভারতে স্থানান্তর করে। তাদের আতঙ্কিত করতে বিমানবন্দরে দিল্লি পুলিশ তাদের অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হয় আর পাহারা দিয়ে তিহার কারাগারে নিয়ে আসে। সেখানে তারা একে অন্যকে তাদের অবস্থার জন্য দোষারোপ করে সময় পার করছিল।

কারাগারে আরেক অনাকাঙ্ক্ষিত উপস্থিতি ছিল হরিয়ানার একজন প্রবীণ মৌলভী। তাকে ধরে আনা হয় প্রতারণার অভিযোগে, একটি উদ্ভাবনী খতম-ই-সুলাইমানি করার জন্য অর্থাৎ এক যুবতী মেয়েকে ভর করা খারাপ আত্মাকে দূর করার জন্য নবি সুলাইমানকে (তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) ডেকে নিয়ে আসার জন্য। মেয়েটির বাবা তাকে ৩০০০ রুপি দিয়েছিল। খতম-ই-সুলাইমানি করার পর মৌলভী তার গ্রামে ফিরে যায়। কিছুদিন পর, সে যখন দিল্লিতে আসে, সে ভাবল যে মেয়েটির বাবার সাথে একবার দেখা করে আসবে, এই বিশ্বাসে যে তিনি হয়তো তার ভক্ত হয়ে গেছেন। মৌলভীর দূর্ভাগ্য, তার খতম-ই-সুলাইমানি কাজ করেনি আর মেয়ের অবস্থাও অপরিবর্তিত থাকে। মেয়েটির বাবা, একজন প্রখ্যাত আইনজীবী, মৌলভীকে প্রতারণার দায়ে গ্রেফতার করায়। দুর্ভাগা মৌলভীর জন্য বিচারকের সামনে খতম-ই-সুলাইমানির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। জামিন পাওয়ার আগ পর্যন্ত এই লোক চার মাস তিহার কারাগারে আটক ছিল।

আফগান নাগরিক গোলাম মাহবুবের মামলাটা চাইলে আপনি নারকীয়ও বলতে পারেন, না চাইলে নাও বলতে পারেন। ইউনাইটেড নেশন কমিশন ফর রিফিউজি তার উদ্বাস্তু অবস্থার মেয়াদ বাড়াতে অস্বীকার করে এই ভিত্তিতে, যে তালিবানের হাতে তিনি নিপীড়িত হওয়ার ভয় পাচ্ছেন তাদের ধ্বংস করা হয়েছে, সুতরাং তার দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। দিল্লিস্থ, জোর বাগ ইউএন হাই কমিশন অফিসের সামনে লোকটি অনশন-ধর্মঘটে বসে। তাকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়। কারাগারে কেউ তাকে পরামর্শ দেয়—এই বলে একটি আবেদনপত্র লিখতে যে, সে আফগানিস্তানে ফিরে যেতে পারবে না কারণ সে তালিবান শাসনের সময় তাদের বিশ্বস্ত একজন ছিলেন আর বর্তমান শাসনে

তিনি নিপীড়িত হওয়ার ভয় পাচ্ছেন। এই চিঠি তাকে আরও বড় বিপদে ফেলে দেয়। কারা কর্তৃপক্ষ তাকে হাইলাইট ওয়ার্ডে বদলি করে দেয় এই ভয়ে যে সে হয়তো একজন তালিবান সমর্থক। তাকে কারাগারে এক বছরের দণ্ড দেয়া হয়।

কারা প্রশাসনের অন্যতম বড় অসুবিধা ছিল আটাশজন অন্ধের অনিশ্চয়তা। পুলিশ তাদের নাম ঠিকমত রেকর্ড করেনি যা কারাগারে ব্যাপক ঝামেলা সৃষ্টি করে। একবার তারা দলবেঁধে অনশন-ধর্মঘটে বসে এবং বলে যে তারা খাদ্যগ্রহণ করবে না যতক্ষণ না কারা তত্ত্বাবধায়ক নিজে তাদের কাছে আসেন আর তাদের সাথে কথা বলেন। কারা কর্মকর্তারা একজন অপরাধীকে কারা তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় নিয়ে আসে। এসব দুর্ভাগারা তার কাছে তাদের দুঃখের বিবরণ দেয় এই বিশ্বাসে যে তারা কারা তত্ত্বাবধায়কের সাথে কথা বলছে। অপরাধী তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয় যে তাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অনশন ভাঙতে প্ররোচিত করে। যদিও তাদের খাবার খাওয়ানোর জন্য এটি করা হয়েছে তবু আমার কাছে মনে হয়েছে এটি ধোঁকাবাজি।

কারাগারে কিছু বিরল বন্দিও ছিল। কারাগারের ভেতরে ছোট পার্কে হাঁসের একটি বসতি ছিল। তাদের রাতের আশ্রয় হিসেবে একটি ব্যারাক সংরক্ষিত ছিল। এদের পাহারা ও দেখাশোনার জন্য একজন অপরাধী সেওয়াদার রাখা হয়েছিল। প্রতিদিন সকালে ছেড়ে দেয়ার আগে আর রাতে বন্ধ করার আগে এদেরকে গোণা হতো। ডিম পাড়া আর হাঁসের বাচ্চা বাড়ানোর দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। হাঁসের ছাড়া ও আটকানোর সময় ছিল বন্দিদের সময়ের অনুরূপ।

আমি কারাগারে খুব বিষণ্ণ ছিলাম, ভয়াবহ খাবার বিশেষ করে চা এর জন্য নয়, অথবা সকাল ৫:৩০ এ উঠানোর জন্যও নয়, ১০:০০ টায় দুপুরের খাবারের পর আটকে রাখার জন্যও নয়, বিকেল ৩:০০ টায় কয়েক ঘন্টার জন্য মুক্তি দেয়ার জন্যও নয়, এবং তারপর সন্ধ্যা ৬:০০ টায় রাতের খাবারের পর আবার আটকে রাখার জন্যও নয়। আমার সবচেয়ে দুঃখ ছিল যে আমার পড়ার মতো কিছু ছিল না বা লেখার সুবিধা ছিল না। আমি আমার আইনজীবীকে বললাম কোর্টে আবেদন করে আমার জন্য লাইব্রেরির সুবিধা পাওয়ার অনুমতি নিয়ে আসতে। যেহেতু লাইব্রেরিটা ছিল অন্য ওয়ার্ডে আর কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি

ছাড়া বন্দিদের অন্য ওয়ার্ডে যেতে পারত না, আমাকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হয়েছিল। সে অনুযায়ী, আমার আইনজীবী ২০০২ সালের ৩ জুলাই কোর্টের কাছে একটি আবেদন করে।

কোর্ট কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে একটি প্রতিবেদন চায়। বিজ্ঞপ্তি পেয়ে কারা কর্তৃপক্ষ আমাকে একদিন লাইব্রেরি যাবার অনুমতি দেয় আর কোর্টের কাছে প্রতিবেদন পাঠায় যে আমাকে ইতিমধ্যে সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা পর্যন্ত লাইব্রেরি যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পরদিন আমি যখন লাইব্রেরিতে যেতে চাইলাম, ওয়ার্ডার আমাকে অনুমতি দিল না। পরবর্তী দশ থেকে পনের দিন এভাবেই চলল। একদিন আমি সহকারী তত্ত্বাবধায়ক থমাসকে দেখলাম এবং তাকে জানালাম যে ওয়ার্ডার আমাকে লাইব্রেরিতে যাবার অনুমতি দিচ্ছে না। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ওয়ার্ডারকে ডেকে আনলেন এবং তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করলেন।

ওয়ার্ডার একে সদয়ভাবে নেয়নি। সে প্রতিশোধ নিয়েছিল। সে আমাকে লাইব্রেরিতে যাবার অনুমতি দিত কিন্তু ঢোকার আগে সবসময় আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করত। এরপর সে আমাকে হুমকি দেয় যে যদি আমি ফিরতে এক মিনিটও দেরি করি তাহলে আমাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখবে। এভাবেই আমি লাইব্রেরিতে মাত্র বিশ মিনিট থাকতে পারতাম। উপরন্তু আমার কোনো বই ধার নেয়ারও সুযোগ ছিল না।

পরে আমি আমার আইনজীবীকে বলি আমাকে ওয়ার্ড নাম্বার ১১-তে বদলি করার জন্য কোর্ট থেকে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দেশনা পাঠানোর অনুরোধ করতে। কারা কর্তৃপক্ষ উত্তর দেয়, 'অপরাধী চাইছে লাইব্রেরির কাছে থাকতে যেটা চলাফেরার সাধারণ জায়গা। এ ধরনের জায়গা কারাগারে তার কাশ্মীরি ও পাকিস্তানি অপরাধীদের সাথে সংযোগ ও যোগাযোগ বাড়াতে সহায়তা করবে। কারা প্রশাসন তাকে এমন পরিবেশে যাবার অনুমতি দেবে না যেখান থেকে সে তার অসৎ নকশা বাস্তবায়নে সফল হতে পারে। তার অনুরোধ তাই অবিলম্বে নাকচ করা হলো।'

প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয় যে আমাকে যেখানে রাখা হয়েছে সেটা প্রথমবারদের জন্য সর্বোত্তম এবং আমার পরিবার থেকে দেয়া দুটি বই আমার

রাখার অনুমতি আছে। স্বাভাবিকভাবেই, কোর্ট এই প্রতিবেদন বিশ্বাস করে এবং আমার ওয়ার্ড নাম্বার ১১-তে বদলির আবেদন নাকচ করে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে, মুলাকাতের সময় কাপড় আর ফল ছাড়া আর কোনো কিছুর অনুমতি আমার ছিল না। আমার স্ত্রী আমাকে বইগুলো পাঠিয়েছে কারা তত্ত্বাবধায়কের অফিসের মাধ্যমে। তারা সেন্সরশিপের নামে সপ্তাহখানেক বইগুলো রেখে দেয়। সাধারণত বইগুলো দেখতে একরাত লাগে। তারা খুশবন্ত সিংয়ের বায়োগ্রাফি এবং নেলসন ম্যান্ডেলার এ লঙ ওয়াক টু ফ্রিডম এর অনুমোদন দেয়নি।

পরে আমি জানতে পারি যে ওয়ার্ড নাম্বার ১১ তে মাত্র তিনজন কাশ্মীরি আছে এবং তাদের কেউই কঠিন অপরাধী নয়। ওয়ার্ড নাম্বার ১০ এ যেখানে আমাকে রাখা হয়েছিল, অনেক কাশ্মীরি এবং কয়েকজন পাকিস্তানি বন্দিও আছে। আমি সত্যিই বিনোদিত হয়েছিলাম একজন প্রথম আগমনকারী বন্দির ভালোর জন্য কারা প্রশাসনের 'উদ্বেগ' এবং আমার 'অসৎ নকশা' নিয়ে তাদের বোধশক্তি দেখে।

এই ব্যাপারটাও হৃদয়ভঙ্গ করার মতো ছিল যে কোর্ট একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে আমার বিশ্বাসযোগ্যতাকে যথেষ্টভাবে বিচার করেনি। কোর্ট সহজভাবে কারা কর্তৃপক্ষের এই যুক্তিই বিশ্বাস করেছে যেন আমি কোনো ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করতে যাওয়া একজন 'অপরাধী' বা ভয়ঙ্কর 'সন্ত্রাসী'। কোর্ট যদি কর্তৃপক্ষের চেহারা দেখেই বিবৃতি গ্রহণ করে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বিচারব্যবস্থার জন্য সেটা অশুভ সংকেত বহন করে। একটি ন্যায়বিচার প্রদানকারী পদ্ধতির জন্য আমলাতান্ত্রিক গোলকধাঁধায় সুচতুরভাবে লুকানো সত্যকে প্রকাশ করার দায়িত্ব সর্বোচ্চ গুরুত্ব রাখে।

প্রায় একমাস পর আমি কারাগারে পত্রিকার ব্যাপারে অনুমতি পেলাম। আমি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বাছাই করলাম। একজন অপরাধী সকাল ৯:৩০ এর দিকে পত্রিকা বিলি করে। পরদিন সকালে যখন আমার কপি নিয়ে শুধুমাত্র খেলার খবরের দুটি পৃষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি অপরাধীকে বাকি অংশের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে সাদামাটাভাবে বলল যে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর পৃষ্ঠা কমিয়ে দুটি করেছে আর এ ব্যাপারে আমার তেমন কিছুই করার নেই।

আসলে বাকি পৃষ্ঠাগুলো সেন্সর করা হয়েছিল কারণ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পেট্রোল পাম্প কেলেঙ্কারি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছেপেছিল।

হিন্দি পত্রিকাগুলোয় এত পরিমাণে সেন্সর করা হতো না। হিন্দ সমাচার নামের উর্দু পত্রিকাটিই একমাত্র কারাগারে অনুমোদন করা হতো। একসময় সেপ্টেম্বরে একেও নিষিদ্ধ করা হলো যে নাগাদ আমি কারা তত্ত্বাবধায়ককে বললাম যে পাঞ্জাব কেশরি গ্রুপ প্রকাশনীর হিন্দ সমাচার আসলে চরম-দেশপ্রেমিক পত্রিকা। আমার মুক্তির কিছু আগে, উর্দু দৈনিক রাষ্ট্রীয় সাহারার ব্যাপারে সম্মতি আদায়ে সফল হয়েছিলাম।

কারাগারে থাকাকালীন আমি আরেকটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলাম সেটি হলো দুর্দশা কুসংস্কার বয়ে আনে। আর কারারুদ্ধ জীবন অসহায়ত্বে মোড়ানো দুর্দশা। কারা জীবনের শুরুর দিকে আমি দেখলাম যে আমি খাবার খেতে পারছি না। আর চায়ের মান এত খারাপ যে আমি চা খাওয়ার অভ্যাস বাদ দিয়ে দিলাম। আমার অবস্থা দেখে একজন বন্দি বলল, 'প্রত্যেক বন্দির জন্য কারা কোটায় তার ভাগ্য নির্ধারিত খাবার থাকে। এটা খেয়ে শেষ করো, তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবে।'

আমি তার কথা খুব বিশ্বাস করতে চাইলাম। যেহেতু মুলাহিজা ওয়ার্ড প্রথমবার আগমনকারীদের জন্য, প্রতিদিনই কিছু বন্দি মুক্তি পেত। একবার এক সপ্তাহের জন্য কাউকে মুক্তি দেয়া হলো না। বন্দিরা অস্থির হয়ে গেল। তারা অশুভ লক্ষণ দেখা শুরু করল। তাদের একজন ব্যারাকের দরজায় ঘুমানো কালো চামড়ার এক হতভাগার উপর চরগিরি করল। তাকেই অপরাধী বিবেচনা করা হলো। তারা সমস্বরে বলতে লাগল, রিহাই কি দেবি (মুক্তির দেবি) তার কুৎসিত চেহারা দেখে নিরস্ত হয়েছেন। তাকে অপমান করে, শাস্তি দিয়ে ব্যারাকের এক অন্ধকার কোণে শুতে বাধ্য করা হলো যাতে দেবি তার কুৎসিত চেহারা দেখতে না পায়। তারা কিছু সবুজ মরিচ আর লেবু গেটের উপর ঝুলিয়ে দিল অশুভ আত্মা দূর করার জন্য।

জ্যোতির্বিদ্যার ভবিষ্যতবাণী করা রবিবারের পত্রিকা কারাগারে খুব জনপ্রিয় ছিল। হস্তরেখা বিদ্যায় যেসব বন্দির ভাসা ভাসা জ্ঞান ছিল তাদেরও খুব খোঁজা হতো।

আমার অজান্তেই আগস্ট চলে এল, আনন্দের সাথে স্বাধীনতা দিবস পালিত হলো। সব বন্দি চক্করে জড়ো হলো। আমার জন্য উপলক্ষটা ছিল মনোবল বৃদ্ধিকারক কারণ আমি বন্দিদের মাঝে এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখলাম যাদের সম্পর্কে আমি পত্রিকায় পড়েছি। তিন নাম্বার কারাগারের বাসিন্দাদেরও দেখলাম। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হলো এবং এ.কে. কুশল টিএসপি জওয়ানদের উপস্থাপিত স্যালুট গ্রহণ করলেন। তিনি তারপর একটি স্বাধীন দেশ হবার গুরুত্বের উপর জোড় দিয়ে একটি ভাষণ দিলেন। এই শ্রোতারা ছাড়া স্বাধীনতার অর্থ আর তাৎপর্য আর কারা ভালো জানবে? উন্নত খাবার হিসেবে সেদিন তৈলাক্ত সয়াবিন আর পরোটা ভাজা দেয়া হলো।

১৭ আগস্ট আমার নাম মুলাহিজা ওয়ার্ডের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলো আর আমাকে আইজিএনওইউ ওয়ার্ডে পাঠানো হলো। সেখানে ভর্তির আগে আমার ওজন মাপা হলো। ভর্তির পরে আমি বারো কেজি কমে গেছি।

আইজিএনওইউ স্টাডি সেন্টারটি প্রাথমিকভাবে ১১ নাম্বার ওয়ার্ডের একটি ব্যারাকে স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু বন্দিদের প্রবল আগ্রহ দেখে পুরো ১১ নাম্বার ওয়ার্ডটিই রাখা হয় কিরণ বেদির 'শিক্ষার মাধ্যমে পুনর্গঠন' ধারণা উপলব্ধির জন্য। পরে উন্মুক্ত শিখন পদ্ধতির অধীনে স্কুল শিক্ষা দেয়ার জন্য ন্যাশনাল ওপেন স্কুল এর একটি স্টাডি সেন্টার চালু করা হয়। কর্তৃপক্ষের মতে, ৮০০'র ও বেশি বন্দি ছাত্র বিভিন্ন একাডেমিক এবং পেশাদার কোর্সে তালিকাভুক্ত আছে। তারা শুরু করেছিল সাতাশজন নিয়ে।

ওয়ার্ডের একটি ব্যারাক লাইব্রেরিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে, আরেকটিতে কম্পিউটার ল্যাব, কমার্শিয়াল আর্ট এবং টাইপিং ক্লাস হয়, যেখানে দুটি ব্যারাক ক্লাসরুম হিসেবে সংরক্ষিত। কম্পিউটার ল্যাবে তিনটি অচল মেশিন আছে যেগুলো দান করেছে ভারত ও বিদেশে কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে নিয়োজিত একটি নামি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সমাজসেবা কর্মকর্তা আমাকে বলেছিলেন যে তাদের দানকৃত কম্পিউটারের দাম ৫০,০০০ এর বেশি হবে না কিন্তু তাদের মহানুভবতা প্রচারের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রায় এক লাখ রুপি খরচ করতে হয়েছে।

কিরণ বেদির সময়ে বন্দিরা স্টাডি সেন্টার ম্যানেজ করত আর কারা কর্মকর্তারা কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারত না। আতবির নামে একজন পুরনো বন্দি যে গ্রাজুয়েশন করেছিল আর পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্সে ভর্তি ছিল। আমাকে

জানায় যে কীভাবে সাহাবুদ্দিন ঘুরি আর গোলাম নবি ওয়ার নামে দুজন প্রাক্তন বন্দি কিরণ বেদি আর কারা তত্ত্বাবধায়ক তারসেম কুমারের সহযোগিতায় স্টাডি সেন্টারের পরিচর্যা করেছিল। যেহেতু সাহাবুদ্দিন ঘুরি ছিলেন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের (জেএনইউ) একজন রিসার্চ স্কলার, তিনি এবং গোলাম নবি ওয়ার সাপ্তাহিক বির্তকের চালু করেছিলেন জেএনইউ হোস্টেলের পরিবেশটা বজায় রাখতে। অনুশীলনটি সাম্প্রতিক সময়েও চালু ছিল, আমাকে বলা হলো।

কিরণ বেদির অন্যান্য পুনর্গঠন এর মতো স্টাডি সেন্টারও একই ভাগ্য বরণ করে। এটি এখন অতীতের একটি ছায়া মাত্র। এমন প্রচুর উদাহরণ আছে যে তিহারে ব্যক্তিই আসল, নিয়ম নয়। অনেক কিছুর অধঃপতনের জন্য দোষটা কারা কর্তৃপক্ষের উপরই বর্গাকারে বর্তায়। একজন অর্ধ-শিক্ষিত অটোরিকশা চালকের উপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল অধ্যক্ষের। শুধুমাত্র যখন ওয়ার্ডের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক দেখলেন যে সে 'অধ্যক্ষ' বানানই পারে না তখন তাকে অপসারণ করা হলো। ওয়ার্ডটি ছিল ছিনতাইকারী, প্রতারক আর জালিয়াতদের আখড়া।

এ সব কিছু সত্ত্বেও, আইজিএনওইউ ছিল তিহারের সব ওয়ার্ডের ভেতর শ্রেষ্ঠ। এটা এখনও তিন নাম্বার কারাগারের সৌন্দর্য। তিহার কারাগারের পরিবেশ কতটা মনোরম তা দেখানোর জন্য দর্শনার্থীদের এখানে আনা হয়। কারা কর্তৃপক্ষ সরল-বিশ্বাসী বহিরাগতদের অন্য কোনো ওয়ার্ড দেখানোর সাহস করে না।

কিন্তু বহিরাগতদের আগমন বন্দিদের জন্য ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি করে। তাদেরকে ওয়ার্ড মাজা-ধোয়া করতে হয়, পরিষ্কার জামাকাপড় পড়তে হয় আর সারাদিন উৎফুল্ল একটা ভাব নিয়ে থাকতে হয় যাতে করে কর্তৃপক্ষকে প্রশংসনীয় দৃষ্টিতে দেখা হয়। একবার বিদেশি পুলিশ ও কুটনীতিকদের একটি দল তাদের ট্রেইনিং প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে কারাগার পরিদর্শনে এসে ব্যারাকগুলো টেলিভিশন সেট, লাইব্রেরি, ক্লাসরুম, কম্পিউটার রুম, আর্ট রুম ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত দেখে প্রভাবিত হয়। আমি তাদেরকে সঙ্গ দেয়া একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে বললাম যে ওদেরকে কারাগারের এমন উজ্জ্বল চিত্র দেখানো উচিত নয় পাছে কারাগারের এমন আরামের কথা শুনে কিছু লোক এখানে চলে আসতে পারে কারণ তাদের নিজ দেশের সাধারণ জনগণের অবস্থা একেবারে খারাপ।

আইজিএনওইউ ওয়ার্ডটি মূলত যারা আইজিএনওইউ বা ন্যাশনাল ওপেন স্কুলে কোর্স করছে তাদের জন্য। কিন্তু অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ক্লাস ১০ বা ১২-তে ভর্তি হয় শুধুমাত্র এখানে থাকার জন্য।

আইজিএনওইউ ওয়ার্ডের লাইব্রেরিটি দক্ষভাবে পরিচালনা করা হতো অতুল কোহলি নামে একজন বন্দির দ্বারা। এর কিছু বই আছে দানকৃত আর কয়েকটার অবস্থা দেখে বোঝা যায় দিল্লি পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বাতিল করা বই। এর তাকে প্রাচীন কিছু বই আছে, ইনস্টিটিউট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ এন্ড এ্যানালাইসিস (আইডিএসএ) এর কিছু পুরনো জার্নাল আছে, তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের বই এবং পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের অল্প কিছু বই আছে। আমি আনন্দিত হলাম যখন ছয় দশকের পুরনো রনবির এর উপর হাত রাখলাম। এটি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক লালা মুলক রাজ সরাফ। পত্রিকাটি মাইক্রোফিল্মে সংরক্ষণ করা উচিৎ এবং গবেষকদের সুবিধার্থে দেশের প্রধান জাদুঘরগুলোয় রাখা উচিৎ।

আইজিএনওইউ ওয়ার্ডটি তুলনামূলকভাবে আরামদায়ক ছিল। বন্দিরা খাবার ব্যারাকের ভেতরে এনে তাদের যখন খুশি খেতে পারত যা অন্য ওয়ার্ডের থেকে আলাদা। কিছু বন্দি দল বানিয়ে, খাবার ঢেলে একসাথে খেত। অবশ্য, শীতকালে খাবার ঠান্ডায় জমে যেত। আর তরকারি বিস্বাদ হয়ে যেত, তেলমশলা ছাড়া, যেন কেউ সিদ্ধ খাবার দিয়ে ডায়েট করছে। যদিও কারাগারের ক্যান্টিনে রান্না করার তেল বিক্রি করা হতো, বন্দিরা ডাল বা সবজিতে তেল ব্যবহার করত না কারণ কারাগারে হিটার ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু 'প্রয়োজন উদ্ভাবনের মূল' এই প্রবাদের অনেকখানি সত্যতা আছে। বন্দিরা তাদের খাবার গরম করার কৌশল আবিষ্কার করেছিল। তারা ইলেকট্রিক কয়েল ব্যবহার করে তার থেকে হিটার বানাত। তারা ব্যারাকের ভেতর বাথরুম-কাম-ল্যাট্রিনকে রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহার করত কারা কর্মকর্তাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি থেকে বাচার জন্য। হিটার ছাড়াও, আইজিএনওইউ এবং এনওএস এর পড়াশোনার জিনিসপাতিও খাবার গরম করার কাজে ব্যবহার করা হতো। যেহেতু কারাগারের ভেতর ম্যাচ আর লাইটারও নিষিদ্ধ, কাগজ জ্বালানোটা ছিল বিশাল ব্যাপার। ব্যারাকের ভেতর ছোট মন্দির আলোকিত করার জন্য যে বৈদুতিক বাতি থাকত সেগুলো থেকে স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে কাগজ পোড়ান হতো। যারা আমার

মতো পড়ার জন্য বই রাখত তাদের ঘড়ি ধরে বই পাহারা দিতে হতো। যারা বই পাওয়ার মতো এত ভাগ্যবান ছিল না তারা বাথরুম আর ল্যাট্রিনে কারা কর্তৃপক্ষ থেকে দেয়া প্লাস্টিকের মগ আর বালতি ব্যবহার করত। শুকনা চাপাতিও জ্বালানি হিসেবে ব্যাবহৃত হত। মুলাকাতের সময় নেয়া খাবার ওয়ার্ডের ভেতর আনা নিষেধ ছিল। যাহোক, কিছু বন্দি বড়সড় ঘুষ দিয়ে খাবার ওয়ার্ডের ভেতরে আনত। সেগুলো তাদের বন্ধুদের জন্য ট্রিট হতো।

একজন ওয়ার্ডার যে ৫:৩০ এর দিকে তালা খুলতে আসত, সে মাত্র দশ পর্যন্ত গুনতে পারত। সুতরাং মাথা গোনার পরিবর্তে সে ব্যারাকের ভেতর গিয়ে শরীর চেক করত, সব কোনা, বাথরুম, ল্যাট্রিনে ভালোকরে খুঁজে দেখে নিশ্চিত হতো যে ভেতরে কেউ নেই। একবার ইবু টমবেই নামে একজন মনিপুরী বন্দি ওয়ার্ডারের সাথে একটু মজা করতে চেয়েছিল। সে তার বেডিং এমনভাবে গুটিয়ে রাখে যাতে মনে হয় কেউ সেখানে ঘুমিয়ে আছে আর ওয়ার্ডারের রাউন্ডে আসার অপেক্ষায় থাকে। আশানুরূপ, ওয়ার্ডার শারীরিক যাচাইয়ে আসে, বেডিং দেখে, কেউ ঘুমিয়ে আছে এটার দিকে এগিয়ে যায় আর লাথি মারতে শুরু করে আর গোটানো বেডকে গালিগালাজ করতে থাকে। যখন বন্দিরা হাসিতে ফেটে পড়ে, নিজের বোকামি না বুঝে আর মজায় যোগ না দিয়ে সে তীব্রভাবে গালিগালাজ করে।

যেহেতু আমি নিজেই আইজিএনওইউ-তে ক্রিয়েটিভ রাইটিং কোর্সে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট এর কমার্শিয়াল আর্ট এ সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হয়েছি, এই সুবিধাজনক ওয়ার্ডে প্রবেশের যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম। তাছাড়া, কারা প্রশাসনের শত্রুতা শেষ হয়ে গিয়েছিল।

স্টাডি সেন্টারের ক্লাসে যোগ দিয়ে আমি পুনর্গঠন প্রোগ্রামের অতিপরিচয়তার উপলব্ধিকে শক্তিশালী করতে পেরেছিলাম। বন্দিরা আমাদের কমার্শিয়াল আর্ট শিক্ষক প্রদীপ কুমারকে 'কার্টুন' ডাকত। তিনি কারাগারে আসতেন ১২ টায় যদিও ক্লাস থাকত ৩:০০ টায়। আমি ছাত্রদের প্রতি তার দায়িত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হতাম যতক্ষণ না আমাকে বলা হলো যে তিনি তাড়াতাড়ি আসেন যেন কারাগারে দুপুরের খাবার খেতে পারেন। তিনিও লঙ্গরে কারাগারে চাকুরীরতদের জন্য তৈরি করা খাবার পান।

প্রদীপের পড়ানোর ধরন ছিল হাস্যকর। সাধারণ ক্লাস শুরু হতো দুজন ছাত্রকে কিছু ছোলা ভাজা আনতে পাঠানোর মধ্য দিয়ে। তিনি পুরো পকেট ভরতেন তারপর একটা একটা করে খেতে খেতে ক্লাস নিতেন। পকেট খালি হলেই ক্লাস শেষ। তিনি আমাদের ব্যাচকে কীভাবে ইংরেজি বর্ণমালা গ্রাফ পেপারে লিখতে হয় আর তারপর রঙ করতে হয় তা ব্লাকবোর্ডে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। কিছুদিন পর আমরা কী একেছি তা তাকে দেখাতে বললেন। তিনি আমার শীটে এক পলক তাকালেন এবং তারপর ঘোষণা করলেন, 'তুমি কখনো আর্ট শিখতে পারবে না। তুমি শীটটাই নষ্ট করে ফেলেছ। বেরিয়ে যাও আর এটা ঠিক না করে আসবে না।'

পরদিন, আমি নতুন করে বর্ণমালা না একে তাকে একই শীট দেখালাম। তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন আর অন্য ছাত্রদের বললেন আমাকে অনুকরণ করতে।

'এখন আশার আলো দেখা যাচ্ছে,' তিনি হেসে বললেন।

কোর্সটা ছিল তিন মাসের কিন্তু এর মধ্যে শিক্ষক চলে গেলেন। যাহোক, যখন তিন মাস পার হলো কারা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করল যে আমরা যথেষ্ট শিখেছি আর নতুন ব্যাচ ভর্তি করানো শুরু করল।

এ ধরনের শিক্ষক সত্ত্বেও, কমার্শিয়াল আর্ট ক্লাস অসাধারণ কিছু আর্টিস্ট তৈরি করে। লামা আর অশোক এ দুজন অসাধারণ আর্টিস্ট, তাদের ছবি দিয়ে তিহারের চারপাশে সাজানো হয়েছে। তাদের ছবি পরিদর্শক হিসেবে আসা বিশিষ্টজনদের স্মারক উপহার দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আছেন মুখ্যমন্ত্রী শিলা দীক্ষিত এবং বলিউডের প্রখ্যাত সুরকার বাপ্পী লাহিড়ী। আমার অশোক আর লামার কাজ দেখার সুযোগ হয়েছিল। তারা বিস্ময়করভাবে দক্ষ এবং ব্রাশের সামান্য আঁচড়েই সুন্দর ছবি আকতে পারত।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেইনিং ইন্সটিটিউট এর আরেকজন সমান দায়িত্ববোধসম্পন্ন শিক্ষক পুসা টাইপিং শেখাত। তিনি ছিলেন কঠোর নিয়মানুবর্তী আর একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি চাইতেন ছাত্ররা সবসময় সতর্ক আর মনোযোগী থাকবে। তিনি তিহার এক সাপনা (তিহার একটি স্বপ্ন) শিরোনামে তিহারের বন্দিদের পাওয়া আরাম-আয়েশ আর সুযোগ সুবিধা নিয়ে অভ্যন্তরীণ সংবাদবাহী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যেসব বন্দি তার স্বেচ্ছাচারি আচরণ মানতে পারত না তারা প্রার্থনা

করত যে তার স্বপ্ন সত্যি হোক আর সে নিজেও 'তিহারের আরাম-আয়েশ' এর স্বাদ পাক।

তিহারের আইজিএনওইউ স্টাডি সেন্টারের সাফল্যের মধ্যে একটি হলো আইজিএনওইউ থেকে একজন অভিযুক্তের গ্রাজুয়েট হওয়া এবং কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসেবরক্ষক নিযুক্ত হন। আরেকজন বিচারাধীন বিনোদ যে ভারতীয় পেনাল কোড ৩০২ ধারার অধীনে হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ছিল, পাঁচবছর আগে ২৫,০০০ রুপিতে জামিন পায়। এটি তার জন্য একটি আশীর্বাদ ছিল। বিজয় কারাগারে এসেছিল নিরক্ষর হয়ে, সে আটক থাকাকালীন কঠোরভাবে পড়াশোনা করে। এখন সে একজন কমার্স গ্রাজুয়েট। তার মামলার শুনানি শেষ, সে উদ্বিগ্নচিত্তে কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করছে।

আইজিএনওইউ কোর্সে উপযুক্ত পরীক্ষাও নেয়া হয়, কিন্তু ওয়ার্ডে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা লোক দেখানো। ব্যাপকভাবে নকল হতো যেহেতু আইজিএনওইউ থেকে সাধারণত কেউ পরীক্ষার তদারকি করতে আসত না। কিছু সুসংহত 'ছাত্র' উত্তরপত্র পরীক্ষা হলের বাইরে নিতে পারত, যেগুলো পূরণ করে ফেরত দেওয়া হতো।

একবার আমি পরিদর্শকের দায়িত্বে ছিলাম। আমি নকল করতে নিষেধ করি আর উত্তরপত্র বাইরে নিতে দেইনি। ছাত্ররা ওজর দেখাল যে কেউ পাস করবে না। একজন সিনিয়র ছাত্র যুক্তি দেখাল যে স্টাডি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বন্দিদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা প্রদানের জন্য যাতে তারা বাইরে গিয়ে ভালো চাকুরী পায় আর অপরাধে ফিরে না আসে। কারাবন্দি অবস্থায় পড়াশোনা করা এত মজা না কারণ সেখানে ভালো কোনো অনুষদ নেই। সুতরাং ছাত্রদের ধৈর্য আবশ্যক। একজন ছাত্র বলেছিল যে, আমি অকারণে তার সাথে কড়া আচরণ করি। বোধোদয় হলো তারা ঠিকই বলেছে. স্টাডি সেন্টারটি আসলে একটি প্রহসন। বন্দিদের ভেতরের শিক্ষকদের মাত্র পঞ্চাশ রুপি প্রদান করা হয়।

অভিযোগ করা হলে আমাকে পরদিন দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

সম্মানজনক ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসের প্রথম নিয়োগপ্রাপ্ত নারী ছিলেন কিরণ বেদি যাকে তিহার কারাগারে ইন্সপেক্টর জেনারেল, কারাগার, পদে শাস্তি দেয়ার জন্য পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু একজন সাহসী অফিসার হিসেবে পরিচিত

বেদি, পৃথিবীকে দেখিয়ে দিলে চাইলেন, এটাকে নিলেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে, পৃথিবীর বৃহত্তম কারাগারে পুনর্গঠনমূলক অনেক কিছু প্রবর্তন করলেন। সাত মাসের সল্প সময়ে, তিনি কিছু পরিবর্তন সাধন করলেন যেগুলো তার বন্দীত্ব আর শাস্তিমূলক কাজের ধারণার সাথে সম্পৃক্ত। শিক্ষার মাধ্যমে পুনর্গঠন ছাড়াও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে পুনর্বাসন ও উপাসনা আর ধ্যানের অনুশীলন চালু করেন, তিনি কারাগারে স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা এবং জীবনযাত্রা উন্নত করেন।

যাহোক, তার গৃহীত বেশিরভাগ পুনর্গঠনই টিকে থাকেনি, বিশেষকরে হাসপাতালে। চিকিৎসকরা এখনও সব ধরনের রোগীকে একটি কমন ঔষধ দেন, যেন ট্যাবলেটটি জ্বর থেকে পেটব্যথা কফ থেকে ঠান্ডা সবধরনের অসুস্থতায় মহৌষধ।

একবার যখন টিভি স্ট্যান্ডের নিচে হিটারে কিছু বন্দি তাদের খাবার গরম করছিল, একজন কারা কর্মকর্তা তাদের ব্যারাকের বাইরে পায়চারি করছিল। বন্দিরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। তারা হিটারটি বের করেও আনতে পারছিল না, আবার ডাল যদি রেখে দেয়া হয় তাহলে পুড়তে শুরু করবে আর এর গন্ধ ওয়ার্ডারকে আকর্ষিত করবে। তারা একটি বুদ্ধি বের করল। তাদের মধ্যে এক বন্দির সম্প্রতি অপারেশন হয়েছে আর তার বুকে এখনও কিছু সেলাই রয়ে গেছে। তারা তাকে বলল সে যেন তীব্র ব্যাথার ভান করে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করে তাহলে ওয়ার্ডারকে চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য আনতে পাঠানো যাবে। সে লোকটি তার কাজ খুব সুন্দরভাবে করল এমনকি অজ্ঞান হওয়ারও ভান করল। যেহেতু সে ছিল হার্টের রোগী, কারা কর্মকর্তা দৌড়ে চিকিৎসক ডেকে আনল। ইতিমধ্যে হিটার বন্ধ করা হয়েছিল। একজন চিকিৎসক আসলেন। কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে তিনি গ্রিলের অন্যপাশ থেকে রোগীর নিতম্বে দুটি ঔষধ দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে নিয়ে ফিরে এলেন। দরজা খুলে বন্দিকে কারা হাসপাতালে নেয়া হল। তিনদিন ধরে সে সেখানে ছিল আর উদার হস্তে তার শিরায় ঔষধ দেয়া হতো। কিছু ভাজা ডালের কারণে তাকে এভাবে ভোগানোর জন্য সে সানন্দে তার বন্ধুদের গালিগালাজ করত।

একদিন আমিও অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গেলাম। আমাকে একটা তোশক আর বালিশের বিছানা দেয়া হলো। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে একটা ভালো

বিছানায় ঘুমাতে কেমন লাগে, আমি সারা রাত এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিলাম।

পরে লক-আপের সময়ে আমার তীব্র পেটব্যথা হলো। আমি ওয়ার্ডারের কাছ থেকে চিকিৎসক দেখানোর অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দিলেন আর আমার সঙ্গে একজন সেওয়াদার পাঠিয়ে দিলেন। চিকিৎসকরা আমার কোনো কথা না শুনেই, আমার পেট না ধরেই, কিছু ট্যাবলেট দিলেন। আমি ঔষধ নিয়ে ফিরে এলাম আর একটা ট্যাবলেট খেলাম। রাত ১০:০০ টার দিকে আমার পেটের ব্যাথা চরম পর্যায়ে চলে গেল। আমি বমি করতে শুরু করলাম আর প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম। আমার বন্দি সাথী সাহায্যের জন্য চিৎকার করল। প্রায় আধাঘণ্টা পর একজন কারা কর্মকর্তা আসলেন।

'কী হয়েছে?' তিনি গালাগালি বর্ষণ করে জানতে চাইলেন।

'একজন অসুস্থ,' কেউ উত্তর দিল।

'কে?'

'গিলানি'

তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। 'ওকে মরতে দাও, বিশ্বাসঘাতক।' বলে তিনি চলে গেলেন। (লোকটি কয়েক দিন পর আমার কাছে একথা বলে ক্ষমা চেয়েছিলেন যে তিনি ভুল করে আমাকে 'পার্লামেন্টওয়ালা গিলানি' ভেবেছিলেন)।

ব্যাথা বেড়েই চলল। আমার সাথী বন্দিরা কোন উপায় না পেয়ে পুনরায় সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করল। একজন ওয়ার্ডার আসলেন আর হাসপাতালে খবর পাঠালেন। একজন চিকিৎসক আবির্ভূত হলেন, গ্রিলের অন্যপাশ থেকে আমাকে দেখে একই ঔষধ দিলেন। আমি তাকে বলতেও পারলাম না যে আমি ইতিমধ্যে এই ঔষধ খেয়েছি। তিনিও চলে গেলেন।

আমি ঔষধটি আবারও বমি করলাম। ব্যাথা অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেল। আমার ব্যারাকের সাথীরা এবার খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক মাস আগে এই ব্যারাকেরই একজন একই অবস্থায় মারা যান। চিৎকার ছাড়া তাদের আর কিছু করার ছিল না। সুতরাং তারা সমস্বরে আবার একই কাজ করা শুরু করল, তাদের কণ্ঠে উদ্বেগ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। আধাঘণ্টা পরে একদল কারা কর্মকর্তা আবির্ভূত হলেন। অভ্যাসমত গালিগালাজের পর জানতে চাইলেন কী

হয়েছে। তাদের সাথে একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়কও ছিলেন। তিনি আমাকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। ওয়ার্ডে আরও তিনজন রোগী ছিল। দুজন রোগীকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস দেয়া হচ্ছিল।

সকালে হাসপাতালে কাজ করা একজন অপরাধী আসে এবং তাদের একজনের মুখ থেকে অক্সিজেন মাস্ক সরিয়ে তাকে মেঝে পরিষ্কার করতে বলে। কিছুক্ষণ পর সে ফিরে আসে আর কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসে থাকা অন্যজনকে বলে শৌচাগার পরিষ্কার করতে। তারপর আসে দুধওয়ালা, রোগীদের মাঝে দুধ বন্টন না করে সে জগটা মাঝখানে রাখে আর আমাদের তাড়াতাড়ি পান করতে বলে। চারজনের জন্য একটা জগ-এদের মধ্যে দুজন আবার যক্ষা রোগী-আমরা তার আদেশ পালন করি।

কারা হাসপাতালের বহির্বিভাগে, যেখানে আমি মাঝে মাঝে যেতাম, সেখানকার চিকিৎসকরা রোগীদের স্পর্শ করতে ইতস্তত করত। তারা স্টেথোস্কোপও ব্যবহার করত না। কারাগারে দাতের সার্জনই একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি তার রোগীদের ভালোমতো চিকিৎসা করতেন আর তাদের দিকে পূর্ণ মনোযোগ দিতেন। অন্তত আমাকে দিয়েছিলেন যখন আমি দাতব্যথা নিয়ে তার কাছে গিয়েছিলাম।

একজন বয়স্ক বন্দি বেশিরভাগ ঔষধ চিনতেন কারণ তিনি একটি ঔষধের দোকান চালাতেন। তার ভয়টা চিন্তা করুন যখন তাকে এমন ট্যাবলেট দেয়া হয়েছিল যা বিশেষকরে সিজোফ্রেনিয়ায় ভোগা লোকদের শান্ত করার জন্য দেয়া হতো। কিছু চিকিৎসক নিয়মিতভাবে তাদের কাছে পরামর্শ নিতে আসা লোকদের তা বিতরণ করতেন।

১৯৯৫ সালে বিচারিক কাস্টডিতে প্রখ্যাত ব্যবসায়ী রাজন পিল্লাই এর মৃত্যু হইচই ফেলে দেয়। অভিযোগ করা হয় যে তিনি তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারে সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান। ইনকোয়ারি কমিশন অ্যাক্ট ১৯৫২ এর ৩ ধারার অধীনে দিল্লি সরকার লীলা সেঠ কমিশন নিয়োগ দেয় তার মৃত্যুর বিষয়ে অনুসন্ধান করার জন্য। এদেশে অনেক গরিব আছে যারা কারাগারে ধুঁকে মরছে কারণ তাদের সুচিকিৎসা দেয়া হয় না। তাদের ব্যাপারে কী হবে? তাদের জন্য কে জবাবদিহি করবে? শুধুমাত্র কোনো কর্মকর্তার বদলিই কী জবাব?

কিরণ বেদির কারা পদ্ধতির সংশোধনের প্রচেষ্টা উৎসারিত হয়েছে তার এই বিশ্বাস থেকে যে কারাগার হচ্ছে মানুষকে শোধরানোর জায়গা তাদের শাস্তি দেয়ার জায়গা নয় কারণ বন্দিত্ব নিজেই একটি শাস্তি যা বন্দিদের তাদের স্বাধীনতা, পছন্দ ও পোষাক পরিচ্ছদ থেকেও বঞ্চিত করে। যদি এগুলোর সাথে বন্দিদের আরও যন্ত্রণা পোহাতে হয় তাহলে তারা একবার সমাজে ফিরে গেলে এর আরও ক্ষতি করবে। অতএব এটাই নিরাপদ আর বিজ্ঞের কাজ হবে যদি ভেতরে থাকতেই তাদের বদলে ফেলা যায়। তিনি বলেন, 'তাদের কারাগারে সংশোধন না করলেই তুমি সমাজকে শাস্তি দিতে যাচ্ছ।'

তিহার কেন্দ্রীয় কারাগারে ইন্সপেক্টর জেনারেল (কারা) থাকাকালীন কিরণ বেদি যেসব সংশোধনমূলক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সেগুলো শুধু তার সময়ের বন্দিদের কাজে লেগেছিল। প্রায় প্রতিদিন তিনি ব্যারাক পরিদর্শনে যেতেন আর বন্দিদের খোঁজখবর নিতেন, এই কর্মকাণ্ডই তাদের সংশোধন প্রক্রিয়ার সাফল্যে বিরাট অবদান রাখে। দূর্ভাগ্যবশত, তার এই আদর্শ ও নিষ্ঠা বাকি কারা প্রশাসনে ছড়ায়নি। তাই তার প্রস্থানের পর প্রোগ্রাম চলতে থাকে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মর্ম কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না।

অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় তিহারে বেদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল সরল ও জনপ্রিয়। তার প্রোগ্রাম শুধু বাস্তব সমস্যাকেই এড়িয়ে যায়নি বরং একজন ভারতীয় বন্দির সামাজিক বাস্তবতাকে ধরতে পারেনি। যেমন, তিনি কারাগারে ধূমপান নিষিদ্ধ করেন কিন্তু ভারতের অনেক কারাগারে ধূমপানের অনুমতি আছে। এর দ্বারা কারা কর্মকর্তারা খুব সহজে ও লোভনীয় উপায়ে অনেক অবৈধ বাড়াবাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। বন্দিরা নিজেরাই কারাগারের ভেতর অতি পাতলা কাগজ ব্যবহার করে সিগারেট উৎপাদনের উপায় পেয়ে গিয়েছিল। ফলে আমাকে আমার ইংরেজি ডিকশনারি ঘড়ি ধরে পাহারা দিতে হতো কারণ এর পাতলা পৃষ্ঠাগুলো সিগারেট উৎপাদনের জন্য অতি উপযুক্ত ছিল। কারা কর্মকর্তারা বন্দিদের জন্য দানকৃত পবিত্র কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ বিতরণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন কারণ এর কাগজগুলোও একই রকম ভালো মানের। তিনি ভয় পেয়েছিলেন যে, যদি এই পবিত্র বইয়ের কাগজ দ্বারা সিগারেট বানানো হয়, তা রক্তাক্ত দাঙ্গার আগুন জ্বালিয়ে দেবে কারণ তিহার কারাগারে বিরাট একটি অংশ মুসলিম।

কারাগারে বেদির আমিষ জাতীয় খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ, দুর্নীতিবাজ কারা কর্মকর্তাদের অর্থ উপার্জনের আরেকটি রাস্তা খুলে দেয়।

বেদি পিটিশন বাক্সের প্রচলন ঘটান যার মাধ্যমে বন্দিরা অভিযোগ জানাতে পারত। চিঠির বাক্সের আদলে গঠিত অভিযোগ বাক্সেগুলো এখনও দেওধির বাইরে দেয়ালে আর প্রতিটি ওয়ার্ডের বাইরে ঝুলতে দেখা যায়। মোবাইল পিটিশন বাক্স, যেটাকে ডিজির পিটিশন বাক্সও বলা হয় এর জায়গায় থাকে। কিন্তু এখন কোনো বন্দি এসব বাক্সে অভিযোগ দাখিল করার সাহস পায় না। কারণ, ডিজির অফিস সব পিটিশন সংশ্লিষ্ট কারা অফিসে অ্যাকশন নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয় আর বন্দিরা হাড়েহাড়ে টের পায় যে অ্যাকশন তো অভিযোগের উপর নেয়া হয় না, নেয়া হয় যে অভিযোগ করেছে তার উপর।

এটা বেদির প্রচেষ্টাকে কলঙ্কিত করা নয়, ভারতে কোনো কারাগারে সংশোধন চেষ্টা সফল হতে পারবে না যদি না সেটা এর সাথে যুক্ত অন্য সরাসরি প্রতিনিধিদের যেমন পুলিশ, কারা কর্মকর্তা, মেডিকেল কর্মচারী এবং সমাজ সেবা কর্মকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে।

যেহেতু আমার কিরণ বেদির সময়ে ঘটা পরিবর্তনের তারতম্য দেখার কোনো উপায় নেই, তাই আমি যা বলতে পারি তা হলো এ মুহূর্তে তিহার কেন্দ্রীয় কারাগার হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে খারাপ কারাগার। আশেপাশে থাকা বন্দিদের সাথে কথা বলে আমি যা বুঝতে পেরেছি যে বেরেলি, ব্যাঙ্গালোর আর রোহতক কারাগার এর চেয়ে ভালো অবস্থায় আছে।

আজ কুসংস্কার আর শাস্তি তিহারে যথেচ্ছাচারে চলে। সেই প্রবাদ যে বন্দিরা সবসময় অপরাধী, এখানে যেন বদ্ধমূল ধারণা। সুতরাং কে ভুল করেছে তা না দেখেই শাস্তি সবসময় বন্দিদের জন্য নির্ধারিত। খুলে বললে, একরাতে, ১০:৩০ এর দিকে কারাগারের সাইরেন বেজে উঠল। আমরা সবাই ভয় পেয়ে গেলাম কারণ এটা কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয়। কারা কর্মকর্তাদের একজন কর্তাব্যক্তি মুলাহিজা ওয়ার্ডে আসলেন এবং সমস্ত বন্দিকে বের হতে বললেন। কয়েক দফায় মাথা গোণা হলো। বন্দিরা ভাবল কারাগার ভাঙার ঘটনা ঘটেছে। জানা গেল ভেতরে যতজন থাকার কথা তার চেয়ে একজন বেশি আছে। রাগের সীমা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। হতাশা আর রাগের আগুনে দুর্ভাগা বন্দিরা দগ্ধ হতে থাকল। অবশেষে, ভোর ৪:০০ টার সময় কারা কর্মকর্তারা আবিষ্কার করলেন যে

নতুন আগমনকারী একজনকে ভর্তি করতে গিয়ে দুইবার লেখা হয়ে গেছে। রেজিস্টার বইতে এক নাম দুইবার এসেছে; একবার বন্দির নিজের নাম, আরেকবার বন্দির বাবার নাম। নিজের কোনো দোষ না হওয়াতেও দুর্ভাগা বন্দিটিকে খারাপভাবে পেটানো হলো।

কারাগারের নিজস্ব ইনটেলিজেন্স সিস্টেম আছে। এটা আমাকে হরি রাম নাই এর কথা মনে করিয়ে দেয়, বলিউড ব্লকবাস্টার শোলেতে জেলার তার বন্দিদের মাঝে যে ছুঁচা লাগিয়ে দিয়েছিল। কেউ জানে না তিহার বন্দিদের মাঝে কী পরিমাণে হরি নাম নাই আছে। একবার এক হরি নাম একজন ওয়ার্ডারকে বলেছিল যে চশমাপরা কেউ একজন তামাক চোরাচালান করেছে। ওয়ার্ডার তথ্যের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ অ্যাকশনে নামে: সব চশমাপরা বন্দিকে ডেকে আনা হয় এবং ব্যাপক পেটানো হয়।

শোলের সাথে সাদৃশ্য জেলারদের মনোভাবকেও প্রকাশ করে। তাদের চলচ্চিত্রের প্রতিরূপের মতো তারাও বলে, 'আমরা ব্রিটিশ আমলের জেলার, আমরা তাদের মতো না যারা বন্দিদের সংশোধনে ব্যাস্ত, কারণ আমরা জানি তোমাদের সংশোধন হবে না।'

আসলে একজন ওয়ার্ডার ফিল্মি স্টাইলে বলত, 'সরকার আমাকে ক্ষমতা দেয়নি নাহলে তোমাদের মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলতাম।'

বন্দিদের মাঝে রসিকতাও কম হতো না। কঠোর নিয়মনিষ্ঠ সহকারী তত্ত্বাবধায়ক ভি.ডি পুশকারনাকে পানিশকরনা সাহেব নামে ডাকা হতো।

বন্দিদের শাস্তি দিয়ে জায়গামতো রাখতে কারা প্রশাসন কুটবুদ্ধি বের করেছিল। বন্দিদের প্রায়ই এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করা হতো। আসলে এটা ব্যাবহৃত হতো ক্রিমিনালদের সংগঠিত হওয়া থেকে বাধা দেয়ার জন্য, কিন্তু এখন এটা ব্যবহার করা হয় এক ধরনের শাস্তি হিসেবে। বন্দিদের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে বদলি করাকে বলা হয় 'গিনতি কাটনা' (তালিকা ছাটানো)। মাঝেমধ্যে এসব বদলি খুব হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে। বন্দিরা প্রায়ই একে অন্যের সাথে গভীর বন্ধন তৈরী করে, ভাবে যে তোমার সাথীকে আর কখনও দেখতে না পাওয়াটা খুব কষ্টের। এর সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে বদলিগুলো হয় হঠাৎ এবং দ্রুত, বিদায় জানানোর সুযোগও থাকে না।

কিন্তু এটাও সমানভাবে সত্য যে বন্দিদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ হয়। তাদের অনেকেই শেভিং ব্লেড আর ছুরি (তাৎক্ষণিকভাবে চামচ আর এধরনের কোনো জিনিসপত্র) দিয়ে করা মারামারির ক্ষতচিহ্ন বহন করে। এজন্য নাপিতদের প্রতিনিয়ত চোখে চোখে রাখা হতো। ব্যারাকের সংঘর্ষ বা কোর্টে আসা যাওয়ার সময় সংঘর্ষ হতো মূলত অতিরিক্ত ভীড়, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা হিংসা থেকে।

বন্দিদের পৃথক করা একটি সম্পূর্ণরূপে বৈধ রীতি যার উদ্দেশ্য হলো কঠিন অপরাধীদের থেকে প্রথমবার আগমনকারীদের দূরে রাখা। যাহোক, এ রীতিটিও এক ধরনের শাস্তি ও অধঃপতনে পতিত হয়েছে। একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নতুন আগমনকারীদের আলাদা করে, সাধারণত তাদের ভর্তির পরদিন, তাদের অপরাধের ধরন বুঝে মুলাহিজা ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। এই রীতি নতুন আগমনকারী, বিশেষ করে যারা হালকা অপরাধে অভিযুক্ত যেমন পকেটমারা, চুরি ইত্যাদি, তাদের জন্য একটি অপমানকর অধ্যায়। অদ্ভূতভাবে, যারা হত্যা, ডাকাতি, অপহরণ এবং আরও অনেক মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত তারা পার পেয়ে যায়। যেসব বন্দি গুপ্তচরবৃত্তি বা এ ধরনের অপরাধে অভিযুক্ত তাদেরও মারাত্মক শাস্তি বা অবমাননার শিকার হতে হয়, যেমন আমার অভিজ্ঞতা তার স্বাক্ষর বহন করছে।

উচ্চ-নিরাপত্তা ওয়ার্ড যাকে তিহারের ভাষায় হাইলাইট ওয়ার্ড বলা হয়, এর ভেতর বন্দিদের আটকে রাখা একটি মারাত্মক শাস্তি, যার সাথে যুক্ত হয় একাকী বন্দিত্ব। উচ্চ-নিরাপত্তা ওয়ার্ডের নিজস্ব 'কাসুরী সেল' আছে। কাসুরীদের দিনে একবার খাবার দেয়া হয়। তাদের কোনো ফ্যান দেয়া হয় না। সাধারণ বন্দিরা একাকী বন্দিত্বের কাসুরীতে আবদ্ধ হওয়াকে এত পরিমাণ ভয় পায় যে এর চেয়ে চক্করে মারাত্মকভাবে পেটানোও তাদের পছন্দনীয়।

হাইলাইটে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ থাকার ফলে বন্দিদের মারাত্মক মানসিক ক্ষতিসাধন হয়। কাউকে দীর্ঘ সময় হাইলাইট ওয়ার্ডে আবদ্ধ রাখার পর সাধারণ ওয়ার্ডে ফিরিয়ে আনলে সে ছন্নছাড়া বোধ করে এবং কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে আবার তাকে হাইলাইট ওয়ার্ডে ফিরিয়ে নিতে। এরকম দুজন বন্দিকে তিন বছর হাইলাইটে থাকার পর তাদের ভালো আচরণের কারণে সাধারণ ওয়ার্ডে বদলি করা হয়। তাদের একজনকে তিহার অলিম্পিকসে অংশগ্রহণ করার জন্য বাছাই করা হয় কারণ সে ক্রিকেটে ভালো ছিল। কিন্তু সে এত মানুষ সহ্য করতে

পারছিল না আর মানুষের গলার হট্টগোলে অসহ্য বোধ করছিল। সে ফিরে যাবার জন্য অনুনয় করে। সে একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়কের কাছে যায় আর তাকে ৫০০০ রুপি অফার করে যেন তাকে হাইলাইট ওয়ার্ডে বদলি করা হয়। তার দুর্ভাগ্য যে সেই কারা কর্মকর্তা তার ঘুষ প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তিনি ছিলেন একজন দক্ষ অফিসার যিনি দায়িত্ব পালন করতেন খুব গুরুত্ব সহকারে।

কিছু আরাম খুঁজে বেড়ানো বন্দির জন্য কারা কর্মকর্তাদের ঘুষগ্রহণ একটি আশীর্বাদ। এটা একটা প্রকাশ্য সত্য যে, কারাগারের কর্মচারীদের লোভকে পরিতৃপ্ত করতে পারলে যে কোন ধরনের প্রয়োজন পুরা করা সম্ভব। সমাজ সেবা বিভাগ ছাড়া কারা প্রশাসনের সব জায়গায় খুশি করার পথ খোলা আছে।

অর্থ উপার্জনে কারা কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় কোনো ধূর্ততা নেই। বলপ্রয়োগে অর্থ আদায় খুব সাধারণ ব্যাপার। বন্দিদের ক্রিমিনাল রেকর্ড তাদের সেই 'গরু' খুঁজতে সাহায্য করে যারা দুধ দেয়। প্রায়ই, প্রতারণা ও জোচ্চুরি মামলায় জড়িতদের পেটানো আর হয়রানি করা হয় যতক্ষণ না তারা কর্তৃপক্ষের চাহিদামতো অর্থ যোগান দিতে না পারে।

ভবিষ্যতে অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশাও কারা কর্মকর্তা আর অপরাধী মুন্সীদের মাঝে নরমভাব তৈরী করে। আমি একজন বন্দিকে আক্ষরিক অর্থেই তার কারাজীবন উপভোগ করতে দেখেছিলাম। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল জাল মুদ্রা রাখার অভিযোগে। সে প্রায় সবাইকেই কারাগার থেকে বের হলেই পুরষ্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

মুলাকাত রুমটি হচ্ছে কারাগারের অন্যতম লাভজনক জায়গা। কারা কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিশ্রুত অর্থ সেখানে আত্মীয়দের দ্বারা পরিশোধ করা হয়। ঘরে বানানো খাবার কারাগারের ভেতর নিতে ৫০০ রুপি খরচ হয়। একজন সাথী বন্দি, অমিত (পরিবর্তিত নাম), একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে যতবার তার ভাই দেখা করতে আসত ততবার তার ভাইয়ের থেকে একশত রুপি নিতে দেখত। একদিন সেই কর্মকর্তা তাকে বলল, 'অমিত, তোমার ভাইয়ের থেকে প্রতিবার একশত রুপি নিতে আমার খারাপ লাগে।' কোনো ঘটনা তার মন বদলে দিল, বিস্মিত অমিত ভাবছিল। কর্মকর্তা পরবর্তী বাক্য, মানুষের আচরণ সম্বন্ধে অমিতের বিভ্রম দূর করে দিল: 'তাকে বলো একেবারে পাঁচশত রুপি দিয়ে দিতে যেন তাকে বারবার দিতে না হয়।'

কারা কর্মকর্তারা যেকোন পর্যায়ে নামতে পারে, যেটা আমি উপলব্ধি করলাম যেদিন একদিন ধোবির স্টোররুমে আগুন লাগল। সকল বন্দিকে বলা হলো যে তারা যেসব কাপড় ধুতে বা ইস্ত্রি করতে দিয়েছিল সব আগুনে পুড়ে গেছে। পরদিন আমরা দেখলাম যে কিছু ওয়ার্ডার সেসব কাপড় পড়ে আছে।

যদিও দিল্লি জেল ম্যানুয়েল ধর্মীয় কার্যকলাপ পালনের জন্য বন্দিদের একত্র হওয়াকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে, প্রতিটি ওয়ার্ডে বন্দিদের মন্দির আর মসজিদের জন্য কিরণ বেদি সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে জায়গায় তারা আত্মিক প্রশান্তি পেতে পারে।

তার ইচ্ছা যদিও মহৎ ছিল, বাস্তবতা স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুকূলে। এটা অবশ্য একটি কারণ যে, যেখানে কারাগারে সামঞ্জস্যহীনভাবে মুসলিম বন্দির হার বেশি, সেখানে কারা কর্মকর্তাদের মাঝে একজনও মুসলিম ছিল না। এটা অদ্ভূত মনে হতে পারে যে, যে সম্প্রদায় একটি দেশের পুরো জনসংখ্যার ১২ শতাংশ জুড়ে আছে, কারাগারে জনসংখ্যার ৩০ শতাংশই মুসলিম। বেশিরভাগ মুসলিম বন্দি তুচ্ছ অপরাধের অভিযোগে কারাগারের ভেতর আছে।

আমার বলা উচিত যে পবিত্র রমযান মাসে কারাগারের পরিবেশ পুরোপুরি বন্ধুসুলভ থাকে।কারা কর্তৃপক্ষ রোযা পালন করতে মুসলিম বন্দিদের সাহায্য করে। তারা তাদেরকে সেহরি (ভোররাতের খাবার) প্রদান করে আর এই খাবারের মান অন্যান্য দিনের তুলনায় ভালো। কিন্তু এই সহযোগিতামূলক আচরণ ঈদের দিন থাকে না। যখন আমি সেখানে ছিলাম তখন মুসলিম বন্দিরা কারা কর্তৃপক্ষকে ঈদের দিন ভালো খাবার প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছিল। তারা তাদেরকে এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করতে বলে, আর বলে যে প্রশাসন সেমাই তৈরীর জন্য দুধ সরবরাহ করবে কিন্তু সেজন্য তাদেরকে সাপ্তাহিক ক্ষীর খাওয়া বাদ দিতে হবে। মুসলিম বন্দিরা ১২,০০০ সমমূল্যের কুপন সংগ্রহ করে সেমাই আর শুকনা খাবারের জন্য। তাদের বিস্ময় কল্পনা করুন যখন তাদেরকে পানিতে রান্না করা সেমাই সরবরাহ করা হয়।

আমি কারাগারে অবস্থানকালে ইসলামের প্রকাশ্য শত্রুতার উপর জঘন্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সেপ্টেম্বরের এক বিকেলে একজন অপরাধী মুন্সী বন্দিদের একটি তালিকা নিয়ে আসে আর তাদেরকে তল্পিতল্পা নিয়ে বেরিয়ে

আসতে বলে। তাদের প্রায় সবাই মুসলিম ছিল। আমার নামও সেখানে ছিল। আমাদের বলা হলো চক্করের দিকে হেটে যেতে ৫ নাম্বার ওয়ার্ডে আটকে রাখার জন্য। আমরা সবাই অনুনয় করলাম যাতে আমাদের ওয়ার্ডে রাখা হয় কারণ আইজিএনওইউ থেকে কোর্স করছিলাম। আমাদের কেউ কেউ বন্দিদের শিক্ষাও দিচ্ছিল। আরেকজন বন্দি ব্যাবসায় প্রশাসনে মাস্টার্স করছিল, সে ছিল তিহারবাসীদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যে এই কোর্সে তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু মুন্সী আমাদের মিনতি কানেই তুলল না। তার কাছে স্পষ্ট আদেশ ছিল।

আমরা যখন চক্করের দিকে যাচ্ছিলাম তখন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক রাজেন্দ্র কুমার আমাকে এই দলে দেখতে পেয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রতিনিধিকে প্ররোচিত করেন আমাকে আইজিএনওইউ ওয়ার্ডে রাখার ব্যাপারে কারণ আমি ছিলাম তার সবচেয়ে নিয়মনিষ্ঠ ছাত্র। সুতরাং আমাকে আইজিএনওইউ ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেয়া হলো আর বাকিরা ৫ নম্বর ওয়ার্ডের দিকে এগিয়ে গেল।

এই পুর্নবিন্যাসের কারণ কয়েকদিন পরে জানা গেল। একদিন গতানুগতিক নিয়মে সকাল ৫:৩০ এ গেট খোলা হলো কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে সকল বন্দিকে তাদের ব্যারাকে ফেরত পাঠানো হলো। কেউ জানে না কী হয়েছে। কেউ জল্পনাকল্পনা করল যে ভারত পাকিস্তানের ভেতর যুদ্ধ লেগেছে। সকল বন্দি সারাদিন আবদ্ধ রইল। পরদিন আমরা দেখতে পেলাম ১০ ও ১১ নাম্বার ওয়ার্ডের দুটি ছোট, উন্মুক্ত মসজিদ উচ্ছেদ করা হয়েছে। 'মসজিদগুলো' মূলত ছিল খোলা জায়গা, ছাদ ছিল না, একটি ছোট আলমারি ছিল যখানে পবিত্র কুরআন রাখা ছিল। মক্কার দিকে মুখ করা দেয়ালটিকে মেহরাবের আকৃতি দেয়া হয়েছিল, মুসলিম স্থাপত্যের প্রতীক গম্বুজ হিসেবে।

কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদানকৃত ব্যাখ্যা ছিল কৌশলী। তারা বন্দিদের বলল যে তারা মসজিদের নিচ থেকে হঠাৎ করে কিছু লুকানো ছুরি পেয়েছেন। এটা ছিল অচিন্তনীয় যে কীভাবে সিমেন্টের মেঝে না ভেঙে এসব জিনিস ওখানে লুকানো যায়।

তিহারের ভেতরে রাস্তায় কিছু মন্দির চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া, ৩ নাম্বার কারাগারের ভেতরে বড়সড় হনুমান মন্দিরও আছে।

যেখানে উপাসনার জায়গার অস্তিত্ব বন্দিদের সংশোধনের কিছুটা আশা জাগায়, একই কথা কারা পরিদর্শনে আসা ভূয়া ধর্মীয় প্রচারকদের বেলায় খাটে

না। যেখানে মন্দির, মসজিদে যাওয়াটা স্বেচ্ছাধীন, কারা প্রশাসন বন্দিদের জোড় করে এসব প্রচারকদের ধর্মোপদেশ শুনতে বাধ্য করত। তাদের অনেককেই বন্দিরা ঔদ্ধত্য আর স্ব-ধার্মিকতার ভান করার জন্য ঘৃণা করত। এসব ধর্মপ্রচারকরা বন্দিদের কঠিন অপরাধী হিসেবে ব্যবহার করত আর নিজেদের বিবেচনা করত তাদের ঠিক করা ও সংশোধনের জন্য ইশ্বর কর্তৃক তাদের পাঠানো হয়েছে। যখন বন্দিরা কারাগারের বাইরে ছিল তখন এরা সবসময় তাদের দলে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করত।

বিদ্যাজ্যোতি কলেজ অব থিয়োলজি এর ফাদার পেডি মেগারকে আমি একমাত্র ব্যাতিক্রমী হিসেবে পেয়েছিলাম। তিনি কখনও ধর্মোপদেশ দিতেন না আর বন্দিদের কি বলার আছে সেটা শুনতে আগ্রহী ছিলেন। ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বোঝা না চাপিয়ে তিনি তাদের পরামর্শ দিতেন। অনেক বন্দি, বিশেষ করে বিদেশিরা তার সাথে লেগে থাকত।

আরেকজন ব্যক্তি যাকে সবাই শ্রদ্ধা করত, তিনি ছিলেন ভিপাসনা প্রোগ্রামের নেতা এস.এন.গোয়েঙ্কা, যার কারাগারের অবস্থার ব্যাপারে গভীর জ্ঞান ছিল। যেহেতু ধ্যানের সাথে ধর্মের সাথে একদমই সংযোগ ছিল না, সকল ধর্মের বন্দিদের কাছে এটা আকর্ষণীয় ছিল।

কিরণ বেদি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষী সংশোধন কাজে সম্প্রদায়টিকে যুক্ত করতে একটি প্রজেক্ট শুরু করেছিল। বলা হয় ঊনত্রিশটিরও বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছে কিন্তু আমার বন্দিত্বকালীন সময়ে আমি তাদের খুব অল্পসংখ্যককে দেখেছিলাম। সংশ্লিষ্ট এনজিওগুলোর মধ্যে দুজন মুসলিম ব্যক্তিত্বকে দেখেছিলাম। কারাগার পরিদর্শনে আসা একমাত্র মুসলিম সংগঠন ছিল তাবলীগি জামাত। তাদেরও ধার্মিকতা নিয়ে ঔদ্ধত্য ছিল। বন্দিরা তাদের উপহাস করত কারণ তারা যে রূপকতা আর উপমা ব্যবহার করত তা ছিল পুরোপুরি অবাস্তব। আমাদের ওয়ার্ডে মসজিদটি ভেঙে ফেলার পর তাদের আসা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার কারাগারে থাকাকালীন সময়ে আর কোন মুসলিম সংগঠন আসেনি। তিহার সাহিত্যে প্রকাশিত তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে কারাগারের ভেতরে তাদের বেশকিছু কার্যক্রমের উল্লেখ আছে, যার ভেতর আছে ইসলামের আলোকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধতার ব্যাপারে বন্দিদের বিশ্বাসী করে তোলার লক্ষ্যে করা

একটি লেকচার প্রোগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ। এই সংগঠন কি সত্যিই মনে করে যে কারাগারের ভেতর যারা আছে তারা সন্ত্রাসী?

অনেক হিন্দু সংগঠন নিয়মিত কারাগার পরিদর্শনে আসত। সাহায্য ইয়োগা, আসা রাম বাপু আশ্রম এবং ব্রাহ্মকুমারির সদস্যরা নিয়মিত পরিদর্শন করত। বেশিরভাগ সময়ে দুর্নীতিবাজ আর অসংবেদী হওয়া সত্ত্বেও এসব ধর্মপ্রচারকরা আসলে কারা প্রশাসন ধার্মিক হয়ে যেত। এসব সংগঠনের অবলম্বনকৃত অনেক আচার সাধারণ হিন্দু বন্দিদের কাছে অচেনা মনে হতো, তাই তারা সেসব আচার পালনে অস্বীকৃতি জানাত।

একটি এনজিও-র পক্ষে একজন মহিলা সমাজকর্মী কারা পরিদর্শনে আসত। নতুন ভর্তি হওয়া বন্দিদের বৈধ উপদেশ দেয়ার এক অদ্ভূত উপায় ছিল তার। ভারতীয় প্যানাল কোডের একটি কপি নিয়ে সে আসত, তাদের ভর্তির টিকেট দেখত, প্রাসঙ্গিক ধারার শর্তাবলি দেখত এবং তারপর একটি শক্তিশালী কর্তৃত্বপরায়ণ কণ্ঠে সে ঐ বন্দিকে বলত যে তার কী দণ্ড দেওয়া উচিত। এটা অনেক বন্দিকে ভয় পাইয়ে দিত।

কারা কর্মকর্তারা নিয়মকানুনের একটি সেট তৈরী করেছিল যেগুলো সকল বন্দিকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হতো। সেই লিখিত আচরণবিধি ছিল নিম্নরূপ—

১. বন্দিরা পান করার জন্য কোনো কাপ ব্যবহার করতে পারবে না।
২. বন্দিরা চেয়ারে বসতে পারবে না, তারা শুধু টুলে বসতে পারবে।
৩. বন্দিরা সবসময় রাস্তার পাশ দিয়ে সারি বেধে চলবে, মাঝখান দিয়ে নয়।
৪. বন্দিরা যখনই কোনো কারা কর্মকর্তাকে আসতে দেখবে তখনই থেমে যাবে আর সে চলে না যাওয়া পর্যন্ত হাটবে না।
৫. বন্দিরা কোন কারা কর্মকর্তার সাথে কথা বলার সময় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকবে আর সবসময় তাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করবে।
৬. কোনো কারা কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে গেলে রুমের বাইরে জুতা রেখে যাবে।

কেউ উপরের নিয়ম ভঙ্গ করলে, এমনকি ভুল করেও ভঙ্গ করলে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতো। একবার আমি দেওধিতে একজন বন্দিকে প্রচণ্ড মার খেতে দেখেছিলাম কারণ সে তার দায়িত্ব পালনের সময় কাপে পানি খাওয়ার

সাহস দেখিয়েছিল। বন্দিদের হুকুমকৃত পানি খাওয়ার স্টিলের গ্লাস তার ছিল না। আরেকজন বন্দি যে সাধারণত অন্যমনস্ক থাকত, একজন কারা কর্মকর্তাকে 'চাচা' (আঙ্কেল) ডেকে ফেলেছিল যে কারণে তাকে নির্দয়ভাবে পেটানো হয় যেন আঙ্কেল সম্বোধন করে সে তাকে উঁচু কর্তৃপক্ষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। আমি একজন বন্দিকে এজন্য শাস্তি পেতে দেখেছি যে সে দেওধির বাইরে একটি বেঞ্চে বসেছিল যখন একজন ডাক্তার সেখান দিয়ে যাচ্ছিল।

আমার বন্দিত্বের পরবর্তী অংশে প্রারম্ভিক হয়রানি ছাড়া আমাকে বন্দিদের জন্য রক্ষিত অমর্যাদা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছিল। দুজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক কুশল আর মীনা আমার সাথে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করত। কিন্তু তারাও বন্দিদের উপর আরোপিত নিয়মনীতি ভাঙতে সাহস করেনি। তাই তারা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে যাবার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল। যখন আমাকে তাদের অফিসে তলব করা হতো, আমার সাথে কথা বলত, তারা চেয়ার ছেড়ে বাইরে হাটাহাটি করত।

এসব নিয়মাবলীর কয়েকটি কিরণ বেদির সময়ে বাদ দেয়া হয়েছিল কিন্তু বন্দিদের তাড়িয়ে বেড়াতে আবার ফিরিয়ে আনা হয়।

একদিন অর্ধ-শিক্ষিত লাইব্রেরিয়ান আমাকে তলব করে যে অতুল কোহলির জায়গায় বসেছে। সে আমাকে বইয়ের একটি তালিকা তৈরী করতে বলে কারণ কারাগার ৩০,০০০ রুপির একটি অনুদান পেয়েছে। আমি একটি বিস্তৃত তালিকা তৈরী করি যার ভেতর ছিল আইনের বই, উপন্যাস, নেতাদের কারাগারের দিনলিপি এবং আইজিএনওইউ-তে যারা কোর্স করছে তাদের বই। এর মধ্যে কারাগারের একটি সারগ্রন্থ বন্দি অধিকারসহ নাগরিক অধিকারের উপরও কিছু বই ছিল।

লাইব্রেরিয়ান তালিকায় দৃষ্টিপাত না করেই সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে সেটা দিয়ে আসে। সে দাম্ভিকতার সাথে বলে যে এটা সে প্রস্তুত করেছে। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। তিনি 'কারা আইন আর কারা বন্দিদের' অধিকার বিষয়ক কোনো বই আশা করেননি। দুর্ভাগা লাইব্রেরিয়ান বুদ্ধিজীবী হতে গিয়ে উল্টো বিপদে পড়ে গেল। কিন্তু সে ছিল একজন পুরনো কর্মী আর জানত কীভাবে এসব পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। সে

সহকারী তত্ত্বাবধায়কের পায়ে পড়ে যায় আর তার কাছে দয়া ভিক্ষা চায়। তড়িৎ গতিতে সে স্বীকার করে যে এই 'অকর্মা' তালিকার লেখক হচ্ছে গিলানি।

কিন্তু ততদিনে আমিও উদ্ধারের কৌশল শিখে গেছি। আমাকে যখন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক তলব করলেন, আমি বললাম যে কারাগারের ভেতরে কারা আইনের উপর বই আনার অনুমতি না থাকার নিয়মটা আমার জানা ছিল না। তার প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর। তিনি হেসে বললেন যে তিনি পুরোটাই জানতেন যে লাইব্রেরিয়ান এই তালিকা প্রস্তুত করতে পারবে না। তিনি আমাকে ফেরত পাঠালেন।

বইগুলো কখনই লাইব্রেরিতে যায়নি।

পাঁচ

মোচড় এবং বাঁক

যদি কোনো ব্যক্তি গোপন নিরাপত্তা সেবা, আইন প্রয়োগ এবং বিচারের গোলকধাঁধার দুনিয়ায় আটকে যায়, তাহলে তার জন্য এর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন যদি সমর্থনের সহাবস্থান, একতা আর ভাগ্যের হাত না থাকে। আমার মুক্তির পথে যাত্রাটি ছিল এমনই এক কঠিন অভিযান, মোচড় আর বাঁকে ভরা, কখনও সহজ ছিল না, ছিল না আন্দাজ, আশা হতাশায় নিমজ্জিত হওয়া আর হতাশা থেকে জেগে ওঠা আশা।

যখন আমাকে লোধি কলোনির দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আমি ভেবেছিলাম হয়তো কয়েক ঘন্টা পরেই আমি বাসায় ফিরে যেতে পারব। আমি কোনো অন্যায় করিনি, আমার পুরো জীবন ছিল সহজ সরল, এবং আমার পুরো বাসা তন্নতন্ন করেও ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর গোয়েন্দারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার মতো কোনো কিছু খুঁজে পায়নি। আমার কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের ভিত্তিতে কোনো ক্রিমিনাল কেস গঠন করা সম্ভব নয়। আর যদি তারা আমার বিরুদ্ধে কোনো মিথ্যা মামলা সাজানোর চেষ্টাও করত তাহলে কোর্ট থেকে সেটা করা হতো, আমি নিশ্চিত ছিলাম। আমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদের বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে আমি নির্দোষ। আর আশা করেছিলাম শুভবুদ্ধির উদয় হবে।

কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে ভুল পথে পরিচালিত করেছিলাম। আমি আমার বাসায় অভিযান করতে আসা আইবি কর্মকর্তাদের কৌশলকে গ্রাহ্য করিনি। আমি তাদের ক্ষমতা আর নাগালকে অবমূল্যায়ন করেছিলাম। যেটা অভিযানের সময়ই সুস্পষ্ট ছিল। দিল্লি পুলিশের কর্মকর্তারা আমার অভিযোগকারীদের কাছ থেকে প্রেসারে ছিল, যাদের ক্ষমতা ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল.কে. আদভানিসহ পুরো প্রতিষ্ঠানকে ভুল পথে পরিচালনা করার। বিচার কার্যক্রম যেভাবে এগোয় তাতে বিচার পদ্ধতির কার্যক্ষমতার উপর আমার বিশ্বাসে তীব্র আঘাত পায়।

কোর্টে আমার প্রথম উপস্থিতির দিনই আমি বুঝতে পারি আমার সুযোগ খুব কম। আমি প্রধান মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সংগীতা সেহগাল ধিংগ্রাকে বলেছিলাম যে আমার কম্পিউটার থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের প্রকাশিত কপি আছে, কিন্তু আমার বিবৃতি রেকর্ড করা হয়নি।

১৮ জুন অভিযোগের উত্তর রুজু করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলেন, 'ইন্টারনেট পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সার্ফ করা হয়েছে কিন্তু উপরেল্লেখিত দলিলে বিদ্যমান তথ্য ইন্টারনেটে সহজলভ্য নয়।' আমার মুক্তিকে বিরোধিতা করা সেই প্রতিবেদনে আরও বলা হয় যে তথ্যের উৎস যাচাই করার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে।

মজার ব্যাপার, যে তাড়ার কারণে ডিজিএমআই এর মতামত আনা হয়েছিল, প্রকাশিত সংস্করণের উৎস যাচাই নিশ্চিত করতে সেই তাড়া ছিল না। আমার বিরুদ্ধে কার্যক্রমের শেষ পর্যন্ত কোনো যাচাই রুজু করা হয়নি।

আমার বন্ধুরা ইসলামাবাদ পেপারের আসল কপি পাওয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে খোঁজাখুঁজি করে যেখানে জার্নালটি নিয়মিত পাওয়া যায়। তারা জার্নালের অন্য ইস্যুর খোঁজ পায়, কিন্তু এই বিশেষ ইস্যুটাই বাদ ছিল। বই আর ম্যাগাজিনের সূচীতে এটা তালিকাভুক্ত ছিল কিন্তু তাক থেকে উধাও হয়ে যায়। সেখানকার কর্তৃপক্ষ জানায় যে ইস্যুটি একদিন আগে তাক থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

ভাগ্যবশত আমার বন্ধু জাল খামবাট্টা ড. শিরীন এম. মাযারির সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন, যিনি ইন্সটিটিউট অফ স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ, ইসলামাবাদ এর ডিরেক্টর জেনারেল। খামবাট্টা তাকে অনুরোধ করেন ইসলামাবাদ পেপারস এর এই বিশেষ ইস্যুটি পাঠানোর জন্য। ড. মাযারি তাকে প্রাথমিকভাবে এই ইস্যুর আসল কপি সরবরাহ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যেহেতু এটি ছিল ১৯৯৬ সালের একটি পুরনো ইস্যু আর জানান যে তিনি আর্কাইভ থেকে এই ইস্যুর ফটোকপি পাঠাতে পারবেন কারণ ইন্সটিটিউটে অল্প কিছু কপি আছে।

যখন খামবাট্টা জানান যে আসল কপিটি প্রদর্শন করা কতটা জরুরি, তিনি অমায়িকভাবে লিখেন, 'আমরা ইসলামাবাদ পেপারস এর একটি বাড়তি আসল কপি জোগাড় করতে পেরেছি। আমরা কুরিয়ারে এটি আপনাকে পাঠাচ্ছি। আমি

আশা করি এটি আপনাকে আপনার কার্যক্রমে সহায়তা করবে।' ছাপানো কপিটি ২১ জুন, ২০০২ তারিখে গ্রহণ করা হয় আর সেটিই কোর্টে দাখিল করা হয়।

আমি কিছু ভারতীয় সাময়িকীতে ড. শিরীন মাযারির প্রবন্ধ পড়েছি কিন্তু আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। খামবাট্টার কাছেও তিনি পরিচিত ছিলেন না, তবুও কার্যক্রমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে সাহায্য তিনি করেছেন তা শেষ পর্যন্ত আমার সম্মানজনক মুক্তিতে ভূমিকা রেখেছে। আমি ড. মাযারিকে তার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

২৪ জুন ২০০২ তারিখে আমার আইন উপদেষ্টা ইন্টারনেটে অন্য একটি ওয়েবসাইটের বাড়তি তথ্য যোগ করে কোর্টের সামনে স্থাপন করে। ডিফেন্স জার্নালের সাইট (http://www.defencejournal.com/2002/january) যেখানে এই তথ্য সহজলভ্য। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আমার জামিন আবেদনের জবাব রুজু করে। ১৫ জুন ২০০২ তারিখে আমার মুক্তির আবেদনের উত্তরে যে দাবি করা হয়েছিল এটি যেন অক্ষরে অক্ষরে তাই নকল করে।

২ জুলাই ২০০২ তারিখে দলিলের প্রকাশিত সংস্করণকে বিবেচনায় এনে আমার আইন উপদেষ্টা ডিজিএমআই এর মতামত জানতে চেয়ে একটি আবেদন উত্থাপন করে। আমার আইন উপদেষ্টাকে ইন্টারনেটের তথ্যটিও দেখাতে বলে যেহেতু অভিযোগকারীরা বলেছে যে তারা সম্পূর্ণরূপে সার্ফ করেও সেটা পায়নি।

৮ জুলাই ২০০২ তারিখে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আবেদনের বিপরীতে জবাব রুজু করে। একই তথ্য ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এই ব্যাপারটিকে বিবেচনায় এনে ডিজিএমআই এর দ্বিতীয় মতামত চেয়ে করা আমার আবেদনটি সিএমএম বাতিল করে দেয়।

বাতিল করার কারণ জানিয়ে আদেশে বলা হয়:

এটা আইনের স্পষ্ট নির্ধারিত ব্যবস্থা যে তদন্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী দ্বারা কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া চলবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে বিচারাধীন দলিলের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ডিরেক্টরেট জেনারেল মিলিটারি অপারেশনস এর মতে, একই বিষয়ে একটি দলিল পাওয়া গিয়েছে যার প্রকাশ ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতার ব্যাপারে প্রভাব ফেলতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আরও মতামত ব্যক্ত করে যে, এই তথ্যের আরও শাখাপ্রশাখা আছে এবং প্রতীয়মান হচ্ছে যে এটা এমন একজন প্রতিনিধি দ্বারা প্রণীত হয়েছে যাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা

হয়েছে সৈন্যদলের শক্তি ও স্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য।

সংক্ষেপে, প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার যুক্তি হচ্ছে যে দলিলটি কোনো গোপন দলিল নয়। দিল্লির রাম স্বরূপ ভি স্টেট ১৯৮৬ সিআরএল.এল.জে৫২৬(৫৩৭ এ)—এ এই প্রস্তাবটিকে ফেলে রাখা হয়েছে যেখানে এটা বলা হয়েছে যে যদি কোনো তথ্য গোপন না হয়/কিন্তু অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ৩ ধারার সংজ্ঞার অধীনে কোনো শত্রুর জন্য বা কোনো অবন্ধুসুলভ শক্তির জন্য উপকারী হয়।

সিএমএম কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তিগুলো ছিল পরস্পরবিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। এটি আইনের স্পষ্ট নির্ধারিত ব্যবস্থা যে বিচারের শেষ দেখার মতো প্রচুর শক্তি কোর্টের আছে। বিচার প্রয়োগে তাদের ভূমিকা গ্রহণে কোর্টের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই যে পর্যন্ত রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা একজন নির্দোষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

যখন কোর্ট বলেছিল, 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষও মতামত দিয়েছে যে তথ্যগুলোর গুরুতর শাখাপ্রশাখা আছে এবং প্রতীয়মান হচ্ছে যে এটা এমন একজন প্রতিনিধি দ্বারা প্রণীত হয়েছে যাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে সৈন্যদলের শক্তি ও স্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য,' এর আরও অনেক যুক্তি আছে দলিলের উপর একটি দ্বিতীয় মতামত প্রদানের আদেশ করার জন্য। আমি দলিলের প্রকাশিত সংস্করণের রেকর্ডে স্থাপিত করেছি এটা প্রমাণের জন্য যে দলিলে বিদ্যমান তথ্য আমার সংগ্রহ করা নয়। এটা ছিল আমার বিরুদ্ধে আনীত মামলা সমর্থন করতে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের পেশকৃত পুরো মতামতকে আবর্জনায় পরিণত করার জন্য যথেষ্ট।

তাছাড়া, কোর্ট আমার আবেদন বাতিল করার ক্ষেত্রে রাম স্বরূপের মামলায় দিল্লি হাই কোর্ট শাসনের উল্লেখ করেছে যে, কোনো দলিলের প্রকাশ আমার বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করতে আদতে কোনো প্রভাব ফেলে না। ড. নারায়ণ উয়ামান নেরুরকার ভি. স্টেট (সিআইবি এর মাধ্যমে) এর ব্যাপারে ক্রিমিনাল রিট ৪০/২০০০ এ দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদানকৃত যুক্তিগুলো এর আদেশকৃত তারিখ ৩০ মে ২০০১ এর সংযোগের সাথে পুরোপুরি প্রাসঙ্গিক। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওএস অ্যাক্টের ৩ ধারা প্রয়োগের আসল পরীক্ষা হচ্ছে তথ্যটি এমন কোনো বিষয়ের সাথে সংযুক্ত কিনা যার প্রকাশ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও

অখণ্ডতাকে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে অথবা বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে, শত্রুর জন্য উপকারী হতে পারে।

সম্পূর্ণভাবে দেখলে এটি আমার মামলায় প্রয়োগযোগ্য নয়। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা স্বীকার করেছেন যে আমি একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছিলাম। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আমাকে অপরাধের সাথে যুক্ত করে এমন একফোঁটা প্রমাণও দেখাতে পারেনি। আমার বিরুদ্ধে একমাত্র বৈধ প্রমাণ ছিল ডিজিএমও এর মতামত যেটা দলিলের প্রকাশিত সংস্করণ উত্থাপনের দ্বারা ভুল প্রমাণ করা হয়েছে। চেহারা দেখেই মতামত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোর্টের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। এবং কোর্টের কাছে আমার বিনীত দাবি ছিল যে যে কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত সংস্করণকে বিবেচনায় এনেছে তাদের কাছ থেকে দ্বিতীয় মতামত নির্দেশ করার জন্য।

ভারতীয় প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত সর্বসম্মত সমাধান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় সংসদীয় অ্যাক্টের অধীনে অধিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ দল সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা করে যে আমার মামলায় রাম স্বরূপের মামলার উল্লেখ করাটা প্রযোজ্য নয়। সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সভাপতিত্বে গঠিত একটি কাউন্সিলের কোনো ক্ষমতা নেই আমার মামলা গ্রহণ করার যেহেতু এটি ছিল বিচারাধীন। যাহোক, বিচারপতি কে.জয়চন্দ্র রেড্ডির সভাপতিত্বে বারানসীতে ১৯ জুলাই ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে কাউন্সিল জানায় যে, 'ইন্টারনেটে প্রকাশ্যে প্রদর্শিত কোনো তথ্য গোপনীয় হতে পারে না এবং এর প্রতিলিপি তৈরি বা দখলে রাখা অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টকে আকর্ষণ করতে পারে না।'

আমার আইনজীবী ওহরি প্রেস কাউন্সিলের সমাধানটি সিএমএম, সংগীতা ধিংগ্রা সেহগালের সামনে উত্থাপন করে। কিন্তু আদেশে সমাধানের উল্লেখ পর্যন্ত ছিল না। হাস্যকরভাবে, সংগীতা এখন ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ওএস অ্যাক্ট সংক্রান্ত একই ধরনের সমাধান নিয়ে কাজ করতে হবে। সংসদের প্রায় পঞ্চাশজন সদস্য কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর সহকারীর কাছে একটি স্মারকলিপি উপস্থাপনও ছিল ভারতীয় প্রেস কাউন্সিলের সমাধানের একটি অংশ। স্মারকলিপিতে বলা হয়:

সিক্রেট অ্যাক্টের অপব্যবহার রোধ করতে ভারতীয় প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্টের ৫ নাম্বার ধারা সংশোধন করার পরামর্শ দিচ্ছে 'এই ধারার অধীনে কোনো কিছু অপরাধ হবে না যদি সেটা প্রবলভাবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ্য আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে যদি না যোগাযোগ বা 'অফিসিয়াল সিক্রেটস' এর ব্যবহার কোনো বিদেশি শক্তির সুবিধার জন্য তৈরী করা হয় বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনোভাবে ক্ষতিকারক হয়।' অন্যদিকে, সংবিধানের পক্ষে কাজ করা ভেঙ্কাটাচালিয়া কমিশন সুস্পষ্ট ভুল বিচার আদেশের পক্ষে ব্যাপক বিচারিক দায়িত্ব সুপারিশ করেছে যা মারাত্মকভাবে নাগরিক স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি বিদ্যমান আইনে এই সংশোধনীগুলো যত দ্রুত সম্ভব চালু করতে যাতে আইন ও কানুন সমর্থিত হয় এবং বিচারব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা সুদৃঢ় হয়।

যারা স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি রঘুনাথ মিশ্র, ফালি এস.নারিমান, আর.কে.আনন্দ, কপিল সিবাল, এডুয়ার্ডো ফালেইরো, ড. রাজা রামনা, প্রীতিশ নন্দি, কুলদীপ নায়ার, প্রফেসর সাইফুদ্দীন সওয, কে নাটোয়ার সিং, ড.বিপ্লব দাস গুপ্তা, ড.এ.আর কিডোয়াই।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আমার আইনজীবীর বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক করেন যে দলিলটি ইন্টারনেটে সহজলভ্য। আমার আইনজীবী দেখানোর চেষ্টা করেন যে এটা ছিল এবং কোর্টকে ইন্টারনেটে দলিলটি দেখাতে বলা হয়েছে। এক সাংবাদিক বন্ধু সবসময় একটি ল্যাপটপ বয়ে বেড়াতেন এই আশায় যে আমার আইনজীবী সফল হবেন।

পুলিশ প্রমাণ দেখায় যে তারা একটি সাইবার ক্যাফেতে ইন্টারনেট সার্ফ করেছে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের মতে তারা সার্ফ করেছে ৩১ জুলাই ২০০২ তারিখে এবং www.issi.org.pk এই ওয়েবসাইটে কিছু পায়নি। যাহোক, প্রমাণটিই বিশ্বাসযোগ্য ছিল না যেহেতু তারা যে দলিল উপস্থাপন করেছে সেটা ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভালোভাবেই তৈরী করা যেতে পারে যেক্ষেত্রে তারা বলতে চাইবে যে দলিল নাই।

অনেক আইবি কর্মকর্তাও কোর্টে আসত তাদের উপরওয়ালাদের মামলার অগ্রগতি জানানোর জন্য। এসব আইবি কর্মকর্তারাই একসময় সাংবাদিকদের সরলতায় হেসেছিল এই কথা বিশ্বাস করতে গিয়ে যে ওয়েবসাইট কোর্টে

দেখানো যেতে পারে। তারা জানত যে তাদের থাবায় তারা সেটি বন্ধ করে দিয়েছে।

তারা যা জানত না সেটা হলো আমার বন্ধুরা ওয়েবসাইট বন্ধ করার জন্য বানানো 'অ্যাপল' ওয়াল ভেঙে ফেলেছে আর এটা ইন্টারনেটে সহজলভ্য। দুঃখের ব্যাপার হলো আমার আইনজীবী ইন্টারনেটে দলিলের অস্তিত্ব দেখাতে কোর্টকে প্ররোচিত করতে পারেনি। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও বিচারক একবার দেখতে আগ্রহী হন যে ইন্টারনেটে দলিলের অস্তিত্ব আদৌ আছে কি না। চেম্বারে একটি ল্যাপটপ আনা হলো যেখানে সে ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু যখন ইন্টারনেট সংযুক্ত করার জন্য তার অফিসিয়াল ফোন ব্যাবহারের অনুমতি চাওয়া হলো, তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। সংযোগ ছাড়া ইন্টারনেট সার্ফ করার কোনো উপায় নেই।

ভারতের বিচার প্রক্রিয়া যে ধীর গতির তা তো জানাই আছে। কিন্তু কত ধীর তা জানলাম যখন ১৮ জুন ২০০২ আমার জামিন আবেদন রুজু করা হলো আর তা বিন্যাস্ত করা হলো ১৩ নভেম্বর ২০০২ এ। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগপত্র রুজু করে ফেলেছে। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা কোর্টের সামনে সকল প্রমাণ জড়ো করতে পারত। আবেদনের ব্যাপারে যে যুক্তিগুলো বিবেচনায় আনা হয় তার ভেতর আছে 'প্রমাণ'।

কোর্ট আমার জামিনে মুক্তির আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যানের যে কারণ উল্লেখ করা হয় তা কোর্টের সাথে থাকা সহজলভ্য রেকর্ডের বিপরীত।

আদেশে, বিপক্ষ দলের যুক্তি রেকর্ড করার পর, কোর্ট চিহ্নিত করে যে, 'তথ্যের উৎস যাচাই করার জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা 'তথ্য' বহনকারী দলিলটি বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে এবং কোনো সন্দেহ নেই যে তারা সেটা যাচাই করতে দীর্ঘ সময় নিয়েছে যেহেতু অভিযুক্তের আটকের পাঁচ মাস পরও এখনও সেটা অপেক্ষায় আছে।'

এটা ছিল রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের মারাত্মক আর্জি যেহেতু দলিলের প্রকাশিত সংস্করণ সামনে আনার পর উৎস যাচাই করা অপরিহার্য দাবি।

তখনও, কোর্ট আমাকে জামিন মঞ্জুর করে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের আর্জির যৌক্তিক উপসংহার টানার পরিবর্তে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের যুক্তির উপরই নির্ভর করে।

আমার বিরুদ্ধে করা মামলার আলোচনা করে আদেশে বলা হয়:

গিলানিকে গ্রেফতার করা হয়েছে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট এর ইউ/এস ৩/৯ এ, এবং ৩ নম্বর ধারা পড়ে বোঝা যাচ্ছে যে যদি কোনো তথ্য যেটা গোপন না হতে পারে কিন্তু কোনো ব্যাপারের সাথে যুক্ত, যার প্রকাশ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুসুলভ সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে পারে বা শত্রুর জন্য উপকারী হতে পারে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ইউ/এস ৩ এ একটি অপরাধ। ১৯৮৬ সিআরআই.এল.জে ৫২৬ রাম স্বরূপ ভি/এস স্টেট।

১৪. তদন্তকালীন সময়ে দলিলটি/'তথ্য'টি আর্মি কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয় বিশেষজ্ঞদের মতামতের জন্য। ডিজিএমও এর মতে ফাইলে থাকা তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। প্রতিরক্ষার সাথে সংযুক্ত এই ফাইলটি আর্মির দ্বারা উদ্ভূত নয়। শত্রুর জন্য উপকারী হওয়ার পাশাপাশি, এটা এমন একজন প্রতিনিধি দ্বারা প্রণীত হয়েছে যাকে বিশেষভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে ভারতীয় সৈন্যদলের শক্তি ও স্থান পর্যবেক্ষণ করার জন্য ও প্রতিবেদন তৈরী করার জন্য যেটাতে জে&কে-তে অপারেশনের পরিকল্পনা ও ব্যাপক শাখাপ্রশাখা রয়েছে। সেখানে একটি সুস্পষ্ট মতামতও রয়েছে যে দলিলে থাকা 'তথ্য' ভারতের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সরাসরি যোগসূত্র থাকতে পারে।

১৫. তদন্তে প্রকাশ পায় যে লোন সাহিবের, যাকে পরে হত্যা করা হয়েছে বলে তদন্তে পাওয়া গেছে, তৎপরতা অনুসরণ করতে বলে গিলানিকে সরাসরি ই-মেইল করা হয়েছে। অভিযুক্ত কর্তৃক গৃহীত ও প্রদানকৃত ই-মেইলে বোঝা যায় যে কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতি তার আগ্রহ ছিল। ভারতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাকিস্তানের আইএসএসআই কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ভারতীয় বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মারা যাওয়া বেসামরিক পাকিস্তানির বিস্তারিত জানিয়ে প্রদানকৃত ই-মেইলও এর মধ্যে রয়েছে। (জোর দেয়া হয়েছে)।

১৬. একটি ই-মেইল দেখাচ্ছে যে অভিযুক্ত, পাকিস্তানি হাই কমিশন কর্তৃক হোটেল মুঘল শেরাটন, আগ্রায় আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন। যাচাই করার পর

প্রকাশ পায় যে, গিলানি জেনারেল মুশাররফের ভারত পরিদর্শনের সময়, পাকিস্তানি সরকারের খরচে মুঘল শেরাটনে তার থাকাটা উপভোগ করেছেন। একজন গোলাম মুহাম্মদ ভাটের সাথেও গিলানির গভীর যোগাযোগ রয়েছে, যিনি ডেপুটি চিফ এওয়ারনেস ব্যুরো, বর্তমানে পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের অধীনে আটক আছে।

১৭. অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের ধারা ৩(২) এর অধীনে এটা দেখানো জরুরি নয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো বিশেষ কাজের জন্য অপরাধী। অবস্থার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনে হতে পারে অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য আচরণই যথেষ্ট।

১৮. আমার মনের দৃষ্টিতে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের ব্যাপকতা ভেসে ওঠে যার শাস্তি কমসে কম ১৪ বছরের বন্দিত্ব। জনগণ, রাষ্ট্র এবং আশেপাশের অবস্থার কথা মাথায় রেখে জামিন মঞ্জুরের কোন সুবিচারের আশা নেই।

আদেশ এই ইস্যু চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় যে কেবলমাত্র অধিকারে থাকাটা কোনো অপরাধ নয়। যেহেতু সামান্য আইন পড়েই এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, ওএস অ্যাক্টের অধীনে অপরাধের আওতায় ফেলতে হলে, সেটি অবশ্যই হতে হবে 'রাষ্ট্রের স্বার্থ ও নিরাপত্তা জন্য ক্ষতিকর এমন কোন উদ্দেশ্যে করা।'

আমার মামলায় যেহেতু দলিলটি রেকর্ডে ছিল, আমার পেশার প্রেক্ষিতে দলিলের বিষয়বস্তুতে না গিয়ে কোর্ট একটি বিশাল ভুল করে।

উপরন্তু, কোর্টের পর্যবেক্ষণের আলোকে যে দলিলের প্রকাশিত সংস্করণ সরবরাহের পরও রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা তথ্যের উৎস যাচাইয়ে সমর্থ না হওয়ায়, ডিজিএমও বিশেষজ্ঞদের মতামত অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

যে ই-মেইলটি আমার দিকে অভিযোগ তুলেছে 'লোন সাহিবের তৎপরতা অনুসরণ করো যাকে পরবর্তীতে হত্যা করা হয়' সেটা ছিল পুরোদস্তুর পেশাদার উপদেশ ধরনের। ই-মেইলটি আমাকে পাঠিয়েছিল নুসরাত জাভেদ, নিউজের সিনিয়র সাংবাদিক। নুসরাত আমাকে উপদেশ দিয়েছিল অনুসরণ করতে, 'আবদুল গনি লোন এবং ইয়াসীন মালিকের চিন্তাধারা এবং তৎপরতা।' অভিযোগপত্রে ই-মেইলের পুরো টেক্সট ছিল কিন্তু আদেশে এর কিছু অংশ ও

বাছাইকৃত পাঠ দেখানো হয়। এটা আমার আটকাদেশকে বর্ধিত করে যদিও আমি ওএস অ্যাক্ট মামলায় ছাড়া পেয়েছিলাম।

আবার, কাশ্মীরে নিহত পাকিস্তানি বেসামরিক সংক্রান্ত ই-মেইলটি ছিল মূলত পাকিস্তানের সমালোচনা এবং আবদুল হামিদ খান কর্তৃক পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নেশনস কমিশন ফর হিউম্যান রাইটসে জমা দেয়া স্মারকলিপির অন্তর্ভুক্ত।

এই অভিযোগ সম্পর্কে যে আমি পাকিস্তান সরকারের আতিথেয়তা উপভোগ করেছি, পুলিশের সংগৃহীত এবং অভিযোগপত্রে থাকা প্রমাণ দৈবক্রমে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের দ্বারা বানানো অভিযোগের বিপরীত। এবং সেখানে কোন প্রমাণ দেখানো হয় নেই যে গোলাম মুহাম্মদ ভাটের সাথে আমার 'ভালো সম্পর্ক' ছিল। এবং ভাটও সেসময় পাবলিক সেফটি অ্যাক্টের অধীনে আটক ছিল না। তিনি ইতিমধ্যেই ছাড়া পেয়েছিলেন।

এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে পাবলিক সেফটি অ্যাক্ট কোন অপরাধ করার শাস্তি হিসেবে প্রদান করা দণ্ডমূলক আইন নয়, এটা হচ্ছে প্রতিরোধমূলক আটক প্রদান করা আইন। আমার বিরুদ্ধে 'দৃষ্টত মামলা' দেবার কোনো অনুমতি নেই ওএস অ্যাক্টের ৩ ধারার প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে। না আমার অবস্থা আর না আমার আচরণ এই সিদ্ধান্ত বয়ে নিয়ে এসেছে। এবং তখনও কোর্ট জামিন না মঞ্জুর করে।

কিন্তু আমিই বিচারের ব্যর্থতার একমাত্র শিকার ছিলাম না। তিহার কারাগারের অনেক বন্দি ভূয়া পুলিশী তদন্ত জালে এবং বিচারব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতিতে আটকে আছে। বেশিরভাগ বিচারাধীন কারাগারে পড়ে আছে তুচ্ছ অপরাধে। পুলিশের সাবেক ইন্সপেক্টর জেনারেল এবং পুলিশ কমিশনের সাবেক সদস্য কে.এফ. রুস্তমজী পিইউসিএল বুলেটিন (নভেম্বর ১৯৮১) তে লিখেন, 'ভারতে রিপিটার অপরাধীর সংখ্যা বরং কম। বিপজ্জনক অপরাধীর সংখ্যা— মানসিক হত্যাকারী, খুনি, পেশাদার ডাকাত, জালিয়াত, জোর করে ধর্ষণকারী— অল্প কয়েকজন হবে।

ভারতের এটর্নি জেনারেল, শোলি সরাবজি, ২০০৩ সালে বলেন, 'অপরাধের ন্যায়বিচার করার পদ্ধতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। যেহেতু ন্যায়বিচার দ্রুত কার্যকর হয় না, মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছে যে কোর্টের ন্যায়বিচারের মতো

আর কোনো জিনিস নেই। হ্যামলেটের আইনের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়ে বিলাপ এখনও ভারতে আমাদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কোর্টে মামলার ভয়ঙ্কর পাওনা আমাদের বৈধ পদ্ধতির উপরে লজ্জাজনক কলঙ্ক, বিশেষভাবে অপরাধীর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা পদ্ধতিতে...এই আগ্রাসনের গুরুত্ব অবমূল্যায়ন করা যাবে না। ন্যায়বিচারে দেরি করা মানে শুধু ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করা নয়, এটা হবে আইনের নিয়মকে ধ্বংসকারী।'

তিহার কারাগারের ভেতর অনেক নির্দোষ ব্যক্তি এই ধ্বংসের প্রমাণ।

যদিও তত্ত্বকথায় আইন আগাম জামিন প্রদানকারী, বাস্তবে এটি আগাম শাস্তি প্রদান করে যেটা প্রচুর। তিহার কারাগারে বিপুলসংখ্যক বন্দি বিচারাধীন আছে। এমনকি কারা কর্মকর্তারাও স্বীকার করেন করেন যে আটক বন্দিদের প্রায় ৬০ ভাগই নির্দোষ। কিছু ক্ষেত্রে অপরাধী হিসেবে যা শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি সময় তারা কারাগারে কাটায়। পিপল ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিস এর মতে, ব্যাঙ্গালোর কারাগারে করা একটি জরিপে দেখা গেছে যে, যাদের বিচার হয়েছে তাদের অর্ধেক খালাস পেয়েছে এবং অপরাধীদের ভেতর ৭৫ শতাংশ প্রত্যেকে ছয় মাসের কম দণ্ড পেয়েছে, এবং মাত্র ৬.৪ শতাংশ এক বছরের বেশি কারাদণ্ড পেয়েছে।

ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সংসদ উপস্থাপিত উপাত্ত প্রকাশিত হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতি অনুযায়ী, ভারতে ছড়িয়ে থাকা ১২৫৯টি কারাগারের মোট ধারণক্ষমতা ২২১,৯৩৭ যেখানে আটক কারাবন্দির সংখ্যা হচ্ছে ২৮৯,০১৩ জন। তাদের মধ্যে মাত্র ৭২,৩০৪ জন হচ্ছে দোষী আর যেখানে ২১৬,৭০৯ জন বিচারাধীন আছে।

ন্যাশনাল কমিশন অফ হিউম্যান রাইটস কর্তৃক পরিচালিত একটি জরিপ অনুযায়ী তিহারে মুলাহিজা ওয়ার্ডে ৯৭.৩ শতাংশ বন্দি বিচারাধীন। এই তথ্য আরও ইঙ্গিত করে যে, দাদরা এবং নগর হাভেলি কারাগারের ৯৪.৮৩ শতাংশ বন্দি, মনিপুরে ৯৩.৯৯ শতাংশ, জম্মু ও কাশ্মীরে ৮৯.৯ শতাংশ, নাগাল্যান্ডে ৮২.০৮ শতাংশ, এবং কর্ণাটককে ৭৯.৫৩ শতাংশ বন্দি বিচারাধীন আছে। বিচারাধীন বন্দির সর্বনিম্ন শতাংশ পাওয়া যায় তামিলনাড়ুতে যেখানে ৩২.৭৮ শতাংশ বন্দি বিচারাধীন।

কারাগারে ধুকে মরা এসব বন্দিদের বেশিরভাগই গরিব এবং নিজেদের জামিনে বের করতে অক্ষম, সেসব সুবিধাপ্রাপ্তদের মতো নয় যারা আটক হলেও আইনের ধরাছোঁয়া এড়ানোর মতো সম্পদ আছে। আমি মুলাহিজা ওয়ার্ডে একজন নেপালি বালককে দেখেছিলাম। সে সেখানে একবছর ধরে ছিল। তাকে কোর্ট থেকে জামিন দেয়া হয়েছে কিন্তু তার নিশ্চয়তা দেয়ার মতো কেউ নেই। কোর্ট তাকে ২৫,০০০ রুপির একটি ব্যক্তিগত মুচলেকা সংগ্রহ করতে বলে, যা পরে কমিয়ে ১০,০০০ করা হয়, তারপর আরও কমিয়ে ৫,০০০ করা হয়। কিন্তু সে ৫,০০০ রুপিও জোগাড় করতে সক্ষম ছিল না।

একজন রিকশাচালককে একশত রুপি চুরির দায়ে ছয় মাস কারাগারে থাকতে হয়েছে। লোকটিকে দোষের অভিযোগের বিপরীতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে বলা হয়েছে যাতে সে কারাগার থেকে বেরোতে পারে। কিন্তু তার পক্ষে সমর্থন করার মতো কেউ ছিল না। সবশেষে, বিচারিক লক-আপের দায়িত্বে থাকা লোক তার আবেদনপত্র তৈরী করে, লোকটি কোর্টের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থন করে এবং ছাড়া পায় যদিও তাকে দণ্ড ভোগ করতে হয়েছে।

দিল্লি হাই কোর্টের বিচারক জে.ডি. কাপুর ২৭ নভেম্বর ২০০২ তারিখে তার আদেশে হাই কোর্টে উপচে পড়া জামিন আবেদনের স্রোতের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বিচারক মন্তব্য করেন যে, যেখানে সুপ্রিম কোর্ট জামিন মঞ্জুর করার মূলনীতি বেধে দিয়েছে, সেখানে অধস্তন কোর্টগুলো ছোটখাটো এবং কম গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে উত্তরোত্তরভাবে জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যান করছে।

বিচারিক কর্মকর্তাদের স্বল্পতা বিচার হতে অত্যধিক দেরি হওয়ার অন্যতম কারণ। ল' কমিশন ১৯৮৭ সালে পাঁচ বছরে বিচারক-জনগণের অনুপাত প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধির সুপারিশ জানায় কিন্তু সরকার এখনও সে সুপারিশ বাস্তবায়ন করেনি। আসলে বিচারপতির শূন্যস্থানই তৎপরতার সাথে পূরণ করা হয়নি। অধীনস্থ বিচারপতি সম্প্রদায়ের অবস্থা আরও খারাপ। ১৩,০০০ পদের মধ্যে ১৮৭৪টি পদ খালি আছে, প্রায় ৩০ মিলিয়ন মামলা কোর্টে ঝুলে আছে।

স্বল্প আর্থিক বরাদ্দ বিচার প্রশাসনে ছড়িয়ে পড়া আরেকটি ইস্যু। ভারতে মোট আয়ের মাত্র ০.৭৩ শতাংশ বিচারব্যবস্থায় ব্যয় করা হয় অন্য দেশগুলোর তুলনায় যেমন যুক্তরাজ্য এবং জাপানে তা যথাক্রমে ১২ ও ১৫ শতাংশ। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে প্রতিবছর অন্তত ১০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে।

নির্দেশনা অনুযায়ী, আগামী তিন বছরে বিচারিক কর্মকর্তাদের ৩৮,০০০ পদ তৈরী করা প্রয়োজন। কাজের চাপের কারণে, নির্ধারিত সময়ে শেষ করা বিচারগুলোর জন্য ট্রায়াল কোর্টগুলোর কাছে হাইয়ার কোর্টের নির্দেশ উপলব্ধি করা কঠিন মনে হচ্ছে।

এমন বন্দির উদাহরণ হচ্ছে অমিত রাত্র, ডাকাতির সহযোগিতায় অভিযুক্ত একজন যুবক বন্দি, সে ছাড়া পায় সাত বছর পর এবং মোহাম্মদ আসলাম এনডিপিএস অ্যাক্টের অধীনে বুকড হয়, যার বিচার একটি হাই কোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ১৭ অক্টোবর ২০০২ তারিখে তিন মাসের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা, কিন্তু সে এখনও কারাগারে ধুকে মরছে।

ওএস অ্যাক্টের অধীনে আটক বিঞ্চুর মামলায় বহু আগে জুলাই ২০০১-তে কোর্ট তদন্ত কর্মকর্তা ছাড়া সকল সাক্ষীর প্রমাণ রেকর্ড করে। যাহোক, আমার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার সময়ও তদন্ত কর্মকর্তার পরীক্ষা নেয়া হয়নি এবং দুর্ভাগা বিঞ্চু কারাগারের পেছনে পড়ে আছে।

তিহারে শোনা আমার সকল গল্প থেকে, আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিলাম এটা জেনে যে, পুলিশ কর্তৃক একজন সাধারণ মানুষকে তুলে নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারে আটকে রাখা অত্যন্ত সহজ। কাউকে শুধু পুলিশ কনস্টেবলের অহংয়ে আঘাত করতে হবে এবং সে আপনার বিরুদ্ধে মামলা বানিয়ে ফেলবে, কেরালা থেকে আসা ভেনুর মতো, তার ভয় আবিষ্কার করুন। সে দিল্লি এসেছিল কোনো পরীক্ষা বা চাকরির জন্য। পরীক্ষার পর সে বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যেখানে তার সাথে একজন পুলিশের আলাপ হয়। পুলিশ ইংরেজি বোঝেনি আর ভেনু তার হিন্দি বোঝেনি। ভেনুকে আটক করা হয় ৬০০ রুপি মূল্যের ৫২ কেজি লোহার গ্রিল চুরির অভিযোগে যা তার ব্যাগ থেকে পুলিশ পুনরুদ্ধার করে। ভেনুর জামিন পেতে দশ মাস লাগে এবং তারপর আরও কয়েক মাস লাগে তার ব্যক্তিগত মুচলেকায় ছাড়া পেতে।

খেই হারিয়ে ফেললাম। আমার গল্পে ফিরে আসি: ১৪ জুন ২০০২, আমার বন্ধু টাইমস অব ইন্ডিয়ার আনুহিতা আমার সমর্থনে একটি স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর করার জন্য বহু সাংবাদিককে প্ররোচিত করে, সরকারকে জোরাজুরি করে যে, 'নিশ্চিত করতে হবে—তদন্ত হবে ন্যায় এবং সঠিক আর গিলানি যেন কর্তৃপক্ষের হাতে কোনো রকম হয়রানি বা অসদাচরণের সম্মুখীন না হয়।' অভ্যন্তরীণ

নিরাপত্তা মন্ত্রী আই.ডি.স্বামীর সম্মুখে উপস্থাপিত আবেদনে ৩০০র ও বেশি সাংবাদিক স্বাক্ষর করে। স্মারকলিপিতে পুলিশকে বলা হয় আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও মামলার সমস্ত কিছু জনসম্মুখে আনার জন্য।

২০ জুন ২০০২ তারিখে এডিটরস গিল্ড অব ইন্ডিয়া আমার জন্য একটি ন্যায় এবং উন্মুক্ত বিচার দাবি করেন। গিল্ড সভাপতি হারিজি সিংয়ের জারিকৃত একটি বিবৃতিতে বলা হয়, গিলানির বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে তার কাছে পাকিস্তান সরকারের একটি 'প্রকাশিত দলিল' ছিল। সিং আরও বলেন, গিল্ড গিলানির মামলাকে গুরুত্বের সাথে দেখছে। যদি গিলানিকে বিচারের সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই আটক করা হয় তাহলে এর ফল হবে একটি গণতন্ত্রে একজন সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে খর্ব করা। তিনি দাবি করেন যে সরকার স্বচ্ছতার স্বার্থে আমার বিরুদ্ধে আরোপিত সকল প্রমাণ জনসম্মুখে আনবে এবং সতর্ক করেন যে সেটা করতে অস্বীকার করা হলে জনগণকে বাধ্য করা হবে 'ডাইনী-খোঁজা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিতে।'

৬ জুলাই ২০০২ তারিখে, দিল্লি ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্টের(ডিইউজি) একটি প্রতিনিধিদল, দিল্লির একটি পেশাদারী-কাম-ব্যবসায়ী ঐক্য দল যার অধিকাংশই সাংবাদিক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এল.কে. আদভানির সাথে তার বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন আমার বিরুদ্ধে করা মামলা তুলে নেয়ার অনুরোধ জানাতে এবং অন্য সাংবাদিকদের নিগ্রহের বিষয়টি তুলে ধরতে।

জাল খামবাট্টা বলেন, তিনি আমার পক্ষে কথা বলবেন এবং আমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।

ডিইউজি আদভানিকে বলে যে, পাকিস্তানের সুবিধার জন্য নিজে গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে অভিযুক্ত করাটা অযৌক্তিক। তারা তাকে নিশ্চিত করে যে তার ইনটেলিজেন্স সংস্থাগুলো তাকে ভুলপথে চালিত করছে। তারা তার সামনে জম্মু ও কাশ্মীরের সশস্ত্র বাহিনীর অগ্রগতির উপর আমার কম্পিউটার থেকে পাওয়া তথ্যসম্বলিত ছাপানো বুকলেটটিও উপস্থাপন করে এবং নির্দেশ করে যে, ইন্সটিটিউট অফ স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ, ইসলামাবাদ থেকে প্রকাশিত বুকলেটটি নিষিদ্ধ নয়। খামবাট্টা তাকে জানায় যে, কথিত বুকলেটটি অনেক সরকারি লাইব্রেরিতে আছে এবং আদতে সিনিয়র বিজেপি নেতা কে.আর. মালকেনির কাছেও আছে।

এমনকি গ্রেফতার হওয়ার ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, খামবাট্টা আদভানিকে জানায়, 'আমার কাছেও একই তথ্যসম্বলিত একটা কপি আছে। যদি এটা এতই বিপজ্জনক হয়ে থাকে যে এর থাকাটা ওএস অ্যাক্টের অধীনে গিলানিকে গ্রেফতার দেখানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাকেও গ্রেফতার করা উচিত।'

ডিইউজি সভাপতি এস.কে. পান্ডে আদভানিকে অনুরোধ করেন সাংবাদিকদের মধ্যে চলতে থাকা হুমকির দিকে নজর দিতে। তিনি তাকে আরও অনুরোধ করেন আমার মামলার দিকে সহানুভূতির সাথে তাকাতে। যাহোক প্রতিনিধিদল সবমিলিয়ে যা পেল তা হচ্ছে নিশ্চয়তা যে আদভানি মামলাটি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং যা 'প্রয়োজনীয়' তা করবেন।

২০ আগস্ট ২০০২ তারিখে, ডিইউজি ভারতের রাষ্ট্রপতি ড.এ.পি.জে আবদুল কালামের কাছে আমার মুক্তির জন্য আবেদন জানায়। রাষ্ট্রপতির অফিস থেকে ডিইউজির আবেদনটি বিবেচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। আবেদনটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্পত্তির প্রান্তরে হারিয়ে যায়।

দলে দলে সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে এবং বারবার আদভানির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাদের অনেককে আশ্বাস দেন যে আমার জামিনের বিরোধিতা করা হবে না কিন্তু এতেও কিছু হয়নি।

দুজন সাংবাদিক বন্ধু সিনিয়র বিজেপি কর্মকর্তার সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেন। তারা আশ্বাস দেন যে আমি পরবর্তী শুনানিতে জামিন পাব। যাহোক এটা ছিল সেই একই প্রতিটি 'পরবর্তী শুনানির দিন'। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা পুরোদমে আমার জামিনের বিরোধিতা করতে থাকে।

ইতিমধ্যে, আনিসা আমার ছোটবোনের বিয়েতে যোগ দিতে শ্রীনগর যায়। সেখানে সে আমার দুজন বন্ধু সুজাত বুখারি ও মাসুদ হুসাইনকে সাথে নিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ড. ফারুক আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে। ড. আব্দুল্লাহ তাকে আশ্বস্ত করেন যে তিনি বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের সাথে কথা বলবেন। তিনি রাজ্য সরকারের একজন সিনিয়র কর্মকর্তাকে নিযুক্ত করেন নিয়মিত মনিটর করতে আর এ ব্যাপারে কী উন্নতি হলো তার সংবাদ তাকে জানাতে।

এর আগে, আমার বাবা সৈয়দ মাসুদ গিলানি, ২৫ আগস্ট ২০০২ আমার বোনের বিয়ের অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান আমাকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

তার আবেদনে বলা হয়, 'আমি হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে চলা এক বাবা। আমার ছেলে ইফতিখার ৯ জুন থেকে তিহার কারাগারে ধুঁকে মরছে। একজন বাবা হিসেবে, আমি বাধ্য হচ্ছি তার বোনের বিয়ের প্রাক্কালে তার শত শত সমধর্মীর সাথে যোগ দিয়ে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও সহকারী প্রধান মন্ত্রীর কাছে তার মুক্তির আবেদন জানাতে।'

তবুও, আমি আমার বোনের বিয়েতে যোগ দিতে পারিনি।

অভিযোগপত্র পূরণের সংবিধিবদ্ধ নব্বই দিনের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল। পুলিশ এক মাসেরও বেশি আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার মামলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমোদন চাইতে গিয়েছে কিন্তু অনুমোদন এ কয় সপ্তাহের জন্য বন্ধ ছিল। অভিযোগপত্র অপূরণ থাকাটা আমাকে জামিন দিতে পারত। এ সময়ে, একজন আইবি কর্মকর্তা আমাকে জানান যে, সরকার আমাকে আইনের অধীনে পরিচালিত করার অনুমোদন দিয়েছে। তিনি আরও বলেন যে অভিযোগ পত্র যথাসময়ে পূরণ করা হবে।

তার কথাই সত্যি হলো। অভিযোগপত্র ৭ সেপ্টেম্বর ২০০২ তারিখে পূরণ করা হলো। পুলিশ রেকর্ডে গ্রেফতারের দিন অনুযায়ী অভিযোগপত্র পূরণের এটাই ছিল শেষ দিন। যদি অভিযোগপত্রটি নব্বই দিনের নির্ধারিত সময়ে পূরণ করা না হতো তাহলে অপরাধমূলক মামলার রীতি অনুযায়ী ৬৭ নাম্বার ধারার অধীনে আমি জামিনে মুক্তি পেতে পারতাম। আমার আশা চূর্ণ হয়ে গেল। ক্লান্তিকর এক বিষাদ আমাকে ছেয়ে ধরল।

আমি ভাবতে শুরু করলাম সব আশ্বাস হয়তো অন্তঃসারশূন্য ছিল। আমি দীর্ঘ এক ধাক্কা খেলাম। যদি সরকার আমাকে জামিন দিতে চাইত তাহলে অভিযোগ পত্র পূরণে কয়েকদিন দেরি করলেই হতো।

সবশেষে অভিযোগপত্র পূরণ হওয়াটা একই সাথে অভিশাপ আর আশীর্বাদ হয়ে এল। অভিযোগ পত্র আটকে রাখা হলে অসাধু উপাদান দিয়ে প্রমাণ তৈরীর সুযোগ করে দেবে এবং আরো মারাত্মক অভিযোগ স্পষ্ট করে দেবে। এখন পুরো ব্যাপারটা স্ফটিকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। পুরো 'আইসবার্গ' প্রকাশিত হয়ে গেল। এবং তা ছিল আকারে প্রবাদতুল্য আগার ছেয়ে ছোট।

কোর্টে পুলিশ কর্তৃক পূরণকৃত অভিযোগপত্রে বলা হয়:

পরিচালিত তদন্তের ভিত্তিতে, বাজেয়াপ্ত করণ, গৃহীত মতামত, অভিযুক্তের ই-মেইল ও ব্যাংক একাউন্টের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার, প্রত্যক্ষদর্শী রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বিবৃতি, অভিযুক্ত সৈয়দ ইফতিখার গিলানির অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ইউএস/৩ ও ৯ ১৯২৩ আর/ডব্লিউ ১২০-বি এবং ২৯২ আইপিসি, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ফাইলে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

অপরাধের মামলা নিবন্ধনের অবস্থা বিশদ জানিয়ে, অভিযোগপত্রে বলা হয় যে ৯ জুন ২০০২ তারিখে তদন্ত কর্মকর্তা ইন্সপেক্টর রমন লাম্বাকে এসিপি রাজবির সিং কর্তৃক আমার বাসায় ডাকা হয় যেখানে আয়কর সহকারী পরিচালক সৌরভ কুমার তাকে আমার কম্পিউটার থেকে বের করে আনা একটি পাঁচ-পৃষ্ঠার ছাপানো দলিল আর একটি অভিযোগ হস্তান্তর করেন। অভিযোগপত্রে বলা হয় যে কম্পিউটার ফাইলের দলিলটি ছিল একটি 'ফোর্সেস' যার সাথে একটি শিরোনাম ছিল 'উল্লেখের জন্য, প্রকাশের জন্য নয়', আর এতে ছিল জম্মু ও কাশ্মীরে সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর শক্তির বিস্তারিত বিবরণ।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী, দলিলটি অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট ১৯২৩, এর ৩ নাম্বার ধারা ভঙ্গকারী। অতএব, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দেয়া হয়েছে। দলিলটি ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি ইনটেলিজেন্সে মতামতের জন্য পাঠানো হয়। ওএস অ্যাক্টের ৯ নাম্বার ধারা এবং ইন্ডিয়ান প্যানেল কোডের (আইপিসি) ১২০-বি ধারা পরে যুক্ত করা হয়।

অভিযোগপত্রে আরও বলা হয় যে প্রেস সাংবাদিকের ছদ্মবেশে আমি ভারতে গুপ্তচরগিরি করছিলাম এবং সেনা ও আধাসামরিক বাহিনীর শক্তির সম্পর্কে তথ্য পাকিস্তানে সরবরাহ করছিলাম।

পরিশেষে, অভিযোগপত্রে আমার থেকে বাজেয়াপ্ত করা এগারোটি পর্ণগ্রাফিক ভিডিও কম্প্যাক্ট ডিস্ক নথিভুক্ত করা হয়। আমাকে যৌন বিকৃতিকারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। 'অভিযুক্তের কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক অধীত হয়েছে আর দেখা গেছে যে বিভিন্ন ই-মেইলে নির্দেশ করছে যে অভিযুক্ত গোষ্ঠীগত যৌনতায় লিপ্ত বা আগ্রহী ছিল। অতএব, আইপিসির ২৯২ ধারা যোগ করা হয়।

অভিযোগপত্রে আমাকে কাশ্মীরের স্বাধীনতার সমর্থক হিসেবে অভিযুক্ত করা হয় এবং প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা হয় 'গিলগিটে সেনাদলের নৃশংসতা' শিরোনামের ই-মেইলটির উপস্থিতিকে যেটায় আছে 'পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের

গিলগিট এলাকায় পাকিস্তানি সেনা এবং ইন্টার সার্ভিসেস ইনটেলিজেন্সের অভিযুক্ত নৃশংসতার বিস্তারিত'। এতে আছে পাকিস্তানি বেসামরিকদের বিস্তারিত বিবরণ যারা ইন্টার সার্ভিস ইনটেলিজেন্স অফ পাকিস্তান (আইএসএসআই) এর দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে ভারতে সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাতে আসে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মারা যায়। অভিযোগপত্রে বলা হয় যে আমি পাকিস্তান সরকারের আনুকূল্যে আগ্রায় হোটেল মুঘল শেরাটনে থাকাটা উপভোগ করেছি।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে আমাকে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল 'লোন সাহেবের তৎপরতা' অনুসরণ করতে, যাকে হত্যা করা হয়েছে।

এটি আরও অভিযোগ করে যে আমার দুইশত মিলিয়ন রুপিরও বেশি আর্থিক লেনদেন ও বিনিয়োগ আছে, অভিযোগপত্র অনুযায়ী যেটা ছিল 'ব্যাখ্যাহীন'।

আনিসা সবসময়ই আশাবাদী ছিল প্রতিবার সে আমাকে বলত যে আমি অতি শীঘ্রই মুক্তি পাব। আমার বন্ধুরাও তার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিত। সে প্রতিটি দরজায় গিয়ে যা সাহায্য পাওয়া সম্ভব আনার চেষ্টা করত। কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করা বাদ দিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে, আমার বন্ধুরা কোন সংসদ সদস্যের কাছে পৌঁছান যে তাদের কথা শোনে। যারা আমার মামলায় সাহায্য করেছিলেন তারা হলেন ড. রঘুভানস প্রসাদ সিং (রাষ্ট্রীয় জনতা দল), রামজিলাল সুমন (সমাজবাদী পার্টি), হান্নান মোল্লা (কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া-মার্কসিস্ট) এবং এডুয়ার্ডো ফালেইরো এবং সুরেশ পাচোরি (উভয়েই কংগ্রেসের)।

একবার কংগ্রেসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ের সময় এর মুখপাত্র আনন্দ শর্মাও আমার জন্য ন্যায়বিচার দাবি করেন। দল বাদ দিয়ে, গোলাম রসুল কর, প্রফেসর সাইফুদ্দীন সওয, আবদুল রাহেদ শাহীন, এবং ইউসুফ তারিগামিসহ জম্মু ও কাশ্মীরের অনেক নেতা আমার নির্দোষিতা সমর্থন করেছেন। গোলাম রসুল কর, সাইফুদ্দীন সওয এবং আবদুল রাহেদ শাহীন আমার বাসায় পর্যন্ত এসেছিলেন একাত্মতা প্রকাশের জন্য। আবদুল রাহেদ শাহীন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে পার্লামেন্টারি স্ট্যান্ডিং কমিটির মিটিংয়ে এই ইস্যুটি তুলে ধরেছিলেন।

আমার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করে দ্য পলিট ব্যুরো অব দ্য কম্যুনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করে।

জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন এখন শেষ এবং মুফতি মুহাম্মদ সাইদ প্রধান শাসকের অবস্থানে আছেন।

এমনকি ক্ষমতায় আসার পূর্বেও, তিনি এবং তার কন্যা মেহবুবা মুফতি আমার জন্য তাদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সাইদ তার প্রথম মিটিংয়েই আমার অনবরত বন্দিত্বের ইস্যুটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরে। তারপর থেকে, এই ইস্যুটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে মিটিংয়ের সময় তার এজেন্ডায় স্থায়ী আইটেম হিসেবে থাকত।

রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে প্রচারণা চালানোর সময় আমার কিছু বন্ধু আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু বিরক্তিকর দুর্বলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এমনকি সাংসদরাও অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন, যদিও তাদের একজন রঘুভানস প্রসাদ সিং এই ইস্যুটি লোকসভায় তুলেছিলেন।

খলনায়ক হিসেবে চিত্রিত হওয়ায় 'গিলানি' শব্দটি একটি নোংরা শব্দে পরিণত হয়েছিল। সিনিয়র সাংসদরাও সংসদ ভবন আক্রমণ মামলার 'এস.এ.আর গিলানির' সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলতেন।

আমার স্ত্রী ছিলেন বাইরের পৃথিবীর সাথে আমার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। সে আমাকে কোর্টে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সময় এবং তিহার কারাগারে সপ্তাহে দুবার পরিদর্শন করার সময় অগ্রগতি সম্পর্কে জানাত। যেদিন মুলাকাত করা যেত, সেদিনটায় সে কদাচিৎ মিস দিত।

এমন এক পরিদর্শনের দিন আমি তাকে পরামর্শ দিলাম জনতা পার্টির সাবেক সভাপতি জয়া জাটলের সাথে সাক্ষাৎ করতে।

আনিসা জয়া জাটলেকে কল করলে সে তাকে তার বাসায় মিটিংয়ের জন্য ডাকল। জাটলে পুরো ঘটনা শুনে বিচলিত হলেন। তিনি আমার মামলাটিকে তৎকালীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফারনানদেজের কাছে তুলে ধরলেন, এবং এর কিছুদিন পর জর্জ, যিনি এই নামেই জনপ্রিয় ছিলেন, আনিসাকে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ডাকলেন।

আনিসাকে তার বাসায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হলো। সে ভাবতেও পারেনি যে সরকারের এত উচ্চ পদে থাকা একজন, ওএস অ্যাক্টের অধীনে সবচেয়ে মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত একজনের স্ত্রীকে এভাবে আপ্যায়ন করতে পারে আর সেটা অতি ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে। জর্জ তাকে পিতৃস্নেহের সাথে

আশ্বস্ত করে যে তার চিন্তার আর কোনো দরকার নেই। তিনি তাকে বাচ্চাদের সহ তার বাসায় উঠে আসতে বলেন যদি সে আমাদের বাসায় ভীতি অনুভব করে থাকে। তিনি বলেন তিনি চেষ্টা করবেন আর কারাগারে আমাকে পরিদর্শন করবেন।

আমার সাংবাদিক বন্ধুরা তাদের প্রচেষ্টা ছেড়ে দেয়নি। যখনই আদভানি মিডিয়ার সংস্পর্শে আসত তারা আমার মুক্তির ব্যাপারে তাকে জ্বালার মধ্যে রাখত।

৩০ অক্টোবর আনিসা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফারনানদেজের কাছে একটি আবেদনপত্র দেয় সেনা কর্তৃপক্ষের প্রদানকৃত বিরূপ মতামত পুনঃমূল্যায়নের আর্জি জানিয়ে। সে বলে যে ১৪ জুন ২০০২ তারিখে ডিজিএমও এর দেয়া মতামত ছিল ভুল যেহেতু তারা দলিলের প্রকাশিত সংস্করণকে আমলে নেয়নি। আবেদনটি তাকে এ ব্যাপারে একটি অনুসন্ধান চালাতে বাধ্য করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বিষয়টি ডিজিএমআই এর কাছে তুলে ধরে এবং আদভানির সাথেও যোগাযোগ করেন, যিনি এখন সহকারী প্রধানমন্ত্রী।

ডিসেম্বর ২০০২ এ আশা জেগে ওঠে যখন আমি সাময়িকভাবে জামিনে বেরিয়ে ঈদ উদযাপন করি এবং আমার তিন বছর বয়সী পুত্র, মুজাদিদের জন্মদিনও পালন করি। যাহোক, এটা হওয়ার কথা ছিল না। আমার জামিন অস্বীকার করা হয়েছিল। জয়া জাটলে জন্মদিনের কথা জানতে পারেন এবং আনিসাকে জোর করেন তা উদযাপনের জন্য। তিনি কিছু বন্ধু নিয়ে আমার বাসায় যান এবং সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটান। আমি বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেলাম।

ডিজিএমআই ছাপানো দলিলটির পরীক্ষা করার আদেশ দেয় এবং নিশ্চিত করে যে আগামী শুনানির আগেই পূর্ব মূল্যায়নকে বাতিল করা মতামতটি দিল্লির পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছে যাবে।

একটি সেশন কোর্ট ইতিমধ্যে দিল্লি পুলিশকে মিলিটারি থেকে একটি নতুন মতামত নিশ্চিত করতে বলে। ডিজিএমআই এর কাছে যাওয়ার পরিবর্তে, যেটা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা প্রথমবার প্রথম মতামত নিশ্চিত করার সময় করেছিল, এবার তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে যায়। কিন্তু আগের মতামতটি ছিল একই কথা।

যাহোক, যখন পরেরদিন আমার আইনজীবী ডিজিএমআই এর আসল মতামত উত্থাপন করে, বিচারক ডিজিএমআই এবং পুলিশের যুগ্ম কমিশনারকে তলব করে এই বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে বলে। ডিজিএমআই কোর্টে এসে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের শাসনকর্তারা এই অগ্রগতিতে আতঙ্কিত হয় যেহেতু এটা ছিল তাদের জন্য একটি চরম লজ্জার বিষয়।

শেষমেশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজিএমআই এর মতামত প্রত্যাখ্যান করে, এবং একইসঙ্গে মামলা তুলে নেয়ার জন্য দিল্লির এলটি গভর্ণরকে আলাদা আদেশ জারি করে।

আমার মামলা নিয়ন্ত্রণ করা একজন ব্যক্তির উপর এর আয়োজনের দায়িত্ব বর্তায় এবং কঠোর গোপনীয়তার সাথে। তারা আমার স্ত্রীকে, আমার আইনজীবীকে এবং আমাকেও জানায়নি।

সে অনুযায়ী বি.আর.ধিমান, আন্ডার সেক্রেটারি (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) কোর্টের সামনে আসেন এবং বিচারককে ডিজিএমআই এর মতামত প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপ্যারটি জানান এবং সুনিশ্চিত করেন যে সরকার এখনও আমাকে ওএস অ্যাক্টের অধীনে অপরাধী মনে করে।

সিএমএম আবারও ডিজিএমআই এবং পুলিশের যুগ্ম কমিশনারকে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য ১৩ জানুয়ারি বসতে বলে। মামলা মুলতুবি করার একঘণ্টার মধ্যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ফাইলটি এলটি গভর্ণর বিজয় কাপুরের কাছে মামলা তুলে নেয়ার জন্য পাঠিয়ে দেয়।

এলটি গভর্নর মামলা তুলে নেয়ার জন্য আদেশে স্বাক্ষর করে এবং রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের বলা হয় সিএমএম কর্তৃক জারিকৃত মুক্তির আদেশ তার বাসা থেকে নিয়ে আসতে কারণ সেদিন কোর্টের ছুটির দিন হতে পারে। যাহোক সিএমএম বেরিয়ে গেলেন এবং সারাদিনে তার নাগাল পাওয়া গেল না।

পরের দিন, এক শুক্রবারে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা মামলা তুলে নেয়ার জন্য সিএমএম এর কোর্টে যায় কিন্তু সে একইভাবে রেখে দেয় কারণ দিন ইতিমধ্যে নির্ধারণ করা হয়ে গেছে।

দিল্লি সেক্রেটারিয়েট বুধবার, ৮ জানুয়ারি ২০০৩ তারিখে গভীর রাত পর্যন্ত কাজ করে আনুষ্ঠানিকতা সারার জন্য এবং তুলে নেয়ার আদেশ জারি করার জন্য।

সরকার চেয়েছিল যে আমার মুক্তির খবরটি আমার মুক্তির পরদিন জানুক, আমার বাসায় একরাত কাটানোর পর। মামলা তুলে নেয়ার জন্য সরকারের কোর্টের কাছে যাওয়ার খবরটি প্রকাশ হয়ে যায় আর সাংবাদিকরা আমার স্ত্রীকে ঘিরে ধরে। আমার বাসায় কার্যত সাংবাদিকদের একটা ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয়ে যায়, সবাই আনিসা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাক্ষাতকার নিতে চাইছিল।

আনিসা পরের দিনটি বাসা থেকে দূরে থাকার চিন্তাভাবনা করে। সোমবার সকালবেলা, কোর্টে যেতে তাকে বেগ পেতে হয়। পুরো এলাকাটা ইলেকট্রিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার লোকজন দিয়ে গিজগিজ করছিল। তাকে শাল দিয়ে চেহারা ঢাকতে হয়েছিল এবং পরিচারিকাকে রেখে গিয়েছিল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য।

জর্জ ফারনানদেজে শুধুমাত্র আমার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারেই ব্যাপকভাবে সাহায্য করেননি, আমার মুক্তির পর উপশমের ছোয়াও দিয়েছিলেন। প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি আমাকে এবং আমার পরিবারকে তার সাথে কিছু সময় কাটাতে ডেকেছিলেন। আমি কাশ্মীর টাইমসের সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাতে জম্মু যাবার আগে তিনি আমার সাথে কথা বলার জন্য রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনায় যোগ দেয়া বাদ দিয়েছিলেন।

তবু তিনি আরেকটি ডিনারের আয়োজন করেন যেখানে তিনি আমার পরিবারের সাথে অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএমআই এলটি. জেন লোহকাব এবং তার স্ত্রীকে দাওয়াত করেন। ডিজিএমআই চলে যাবার পর তিনি আমাকে সময় ব্যয় করে বলেন আমি যে ব্যাথা ও যন্ত্রণা ভোগ করেছি তা পেছনে ফেলে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পানে এগিয়ে যেতে।

ছয়

মিডিয়ার ভূমিকা

আমি কখনও ভাবিনি যে আমি সেই প্রবাদটির 'অসির চেয়ে মসি অধিকতর শক্তিশালী' বিনির্মাণ এবং পুনর্গঠনের বিষয়বস্তুতে পরিণত হব। কিন্তু আমার তিহার বন্দিত্বের সময় আমি শিখলাম যে কলম দ্বিগুন ধারালো তলোয়ার।

আমাকে একটি দূর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে আমি এটাও বুঝেছি যে আমি কতটা ভাগ্যবান। অনেক কারণে ভাগ্যবান। যেহেতু আমার ভিত্তি ছিল দিল্লি, সঙ্গত কারণেই সাংবাদিক সংঘে আমার বিশাল আকারের বন্ধু ছিল। আমার বন্ধুরা আমাকেও জানত এবং পদ্ধতিও জানত। তারা পরিপূর্ণভাবে সচেতন ছিল যে কীভাবে মিডিয়ার কিছু অংশকে সরকারি সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে। এবং এটা যে শক্তিশালী গণতন্ত্রের এক পাথরের চতুর্থ পিলার নয় যেখানে চাইলেই কিছু করা যায়।

আমি ভাগ্যবান ছিলাম কারণ আমার নিয়োগকর্তা ছিল কাশ্মীর টাইমস। আমাদের সভাপতি বেদ ভাসিন, উনার সর্বশক্তি দিয়ে আমাকে রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন বলেই আমার বিশ্বাস ছিল। কাশ্মীর টাইমস কর্তৃক জারিকৃত একটি আবেদনে বলা হয়, 'এটি তার ইমেজকে কলঙ্কিত করার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে প্রতিহত করার একটি ষড়যন্ত্র। আমরা বিশ্বব্যাপী সাংবাদিক সংঘের থেকে সমর্থন আশা করছি এবং আশা করছি তারা ইফতিখারের জন্য একাত্মতা প্রকাশ করবে এবং একটি পুরোপুরি সাজানো মামলায় তার গ্রেফতারের প্রতিবাদে আমাদের পেছনে থাকবে।' তারা 'ইফতিখার গিলানিকে গ্রেফতারের পেছনের সত্য' নামে একটি প্রচারণা চালায় আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া মিথ্যা মামলা উদঘাটন করার জন্য।

বেদ ভাসিন আমার এবং আমার পরিবারের সাথে দেখা করে। তিনি দিল্লিতে আমার সম্পাদক প্রবোধ জামওয়াল এবং নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন জামওয়ালের কাছে যান। ১৪ জুন ২০০২ প্রবোধ জামওয়াল আনিসাকে সাথে নিয়ে দিল্লিতে একটি প্রেস কনফারেন্স করেন এবং প্রকাশ্যে আমার নির্দোষিতা সমর্থন করেন। দিনগুলো ছিল কঠিন। অনেক মানুষই এমন প্রকাশ্য

সহাবস্থান মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। নিজের জন্য বিশাল ঝুঁকি নিয়ে, প্রবোধ জামওয়াল সেই দলিলের প্রকাশিত সংস্করণ মুক্ত করে যেটাকে সরকার গোপন প্রতিরক্ষা দলিল হিসেবে বর্ণনা করছিল।

আমার বন্ধুরা জানত যে আমার সহকর্মীরা যেসব প্রতিবেদন নথিভুক্ত করছিল সেগুলো বিদ্বেষ বা পক্ষপাত মুক্ত নয়। এবং যদি আমার দিকের কাহিনী জোর করে উপস্থাপন করা না হতো তাহলে তাদের কয়েকজনের ধারণা বদলানো কঠিন হতো। এবং তারা ঠিকই বলেছিল। শীঘ্রই সরকারের কিছু উৎসাহী অংশের দুরভিসন্ধি আমার মামলার উপর প্রতিবেদন পেশ করা বেশিরভাগ সাংবাদিক টের পেয়ে যায় এবং তাদের শক্তি দৃঢ়ভাবে আমার পেছনে ব্যয় করে।

আমি এমন একটি সংঘের সদস্য হতে পেরে গর্বিত যারা অবিচলিতভাবে ছড়িয়ে পড়া মিথ্যা গুজবকে কিছু অন্তর্নিহিত উপাদান দিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করে। আমি গর্ববোধ করি এজন্য যে আমার সংঘ যারা গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে সংহতি প্রকাশ করে যেখানে গণতন্ত্রের প্রথম স্তম্ভ, সংসদের বহু সদস্য আমতা আমতা করেছে।

কারাগারের উঁচু দেওয়ালের বাইরে, সাংবাদিকরা আমার মুক্তির জন্য, সকল বাধা ভেঙে, আদর্শগত বা অন্য যেমনই হোক, কাজ করেছে। কেউ সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে; আবার কেউ গোপনে কাজ করেছে। কিন্তু আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে প্রায় সকল জাতীয় দৈনিকে আমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের করা মামলা ধুয়ে দিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপে।

দিল্লি ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট আমার গ্রেফতারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া জানায়। ডিইউজি অন্তত তিনটি প্রতিবাদ র‍্যালি করে। এর সভাপতি, এস.কে পান্ডে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ায় ছুটে যান এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী এল.কে আদভানিকে অনুরোধ করার জন্য প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন যে আমার গ্রেফতার প্রেসের স্বাধীনতার উপর হামলা এবং আমাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেয়া দরকার। তিনি অন্য সাংবাদিক সংগঠনকেও সংহত করেন।

দ্য এডিটরস গিল্ডও এই প্রতিবাদে অংশ নেয়। এর সভাপতি হারিজিৎ সিং সহ, সম্পাদক দীলিপ পাদগোয়াঙ্কর, এম.জে আকবর এবং সুমিত চক্রবর্তীসহ অন্যান্য সদস্যরা সরকারের কাছে আমার মামলা নিয়ে ছোটাছুটি করেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি, বিশেষভাবে, নিউইয়র্ক ভিত্তিক দ্য কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট, প্যারিস ভিত্তিক রিপোর্টারস সানস ফ্রন্টিয়ারস এবং ব্রাসেলস ভিত্তিক দ্য ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশনস অব জার্নালিস্ট ভারত সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরে। সিপিজে পর্যন্ত ইউএস সেক্রেটারি অফ স্টেট কলিন পাওয়েলকে ভারত সরকারের কাছে বিষয়টি তুলে ধরতে বলে।

এস.কে পান্ডে আনিসার জন্য একজন বড় সমর্থন হিসেবে ছিলেন। তিনি কোর্টের শুনানিতে উপস্থিত থাকতেন এবং যখন প্রতিবার আমার জামিনে মুক্তির সম্ভাবনা দেখতে পেতেন তখনই নিজেকে জামানত হিসেবে দেখাতেন। তিনি দুজন ডিইউজি কর্মী জাল খামবাট্টা এবং উমাকান্ত লাখেরাকে নিযুক্ত করেছিলেন, আমার আইনজীবীকে সহায়তা করার জন্য যদি তার কোনো প্রয়োজন হয়ে থাকে। খামবাট্টা এবং উমাকান্ত আরেকজন সাংবাদিক ধর্মান্দ পি.কামাতকে নিয়ে তিহার কারাগারে ছুটে যান, তিহারে আমার উপর করা অত্যাচারের বিষয়টি কারা তত্ত্বাবধায়কের কাছে তুলে ধরতে।

আরেকজন সাংবাদিক এম.কে ভেনু, ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। পান্ডের মতো তিনিও আমার জন্য জামানত হিসেবে থাকতে চেয়েছিলেন। পান্ডে বা ভেনু কেউই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না এবং তবুও তারা আমার জন্য জামিন হতে চেয়েছেন। তাদের এটুকু ইঙ্গিতই আমার জন্য অনেক কিছু ছিল। এসব স্বল্প পরিচিত সাংবাদিকরা আমাকে যে সমর্থন ও বিশ্বাস জুগিয়েছেন এবং আমার পক্ষে দাঁড়িয়েছেন তা আমাকে আমার বন্দি জীবনে বেচে থাকার রসদ জুগিয়েছে।

আমার নির্দোষিতা দাবি করে আশা খোসার করা প্রথম প্রতিবেদনটি প্রচারণার ফুলঝুরির মাঝেও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে মন্তব্য করতে বাধ্য করে যে, আমার মামলায় কর্তৃপক্ষ চিকন বরফের মাঝে স্কেট করছে।

আমার মুক্তির ব্যাপারে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া আয়োজিত একটি আপ্যায়নে হিন্দুস্তান টাইমসের চিফ ব্যুরো, বিনোদ শর্মা বলেন, '১৯৮৫ সালে রাজিব গান্ধি ডিফেমেশন বিলের পর এই প্রথমবার সাংবাদিকরা কোনো ব্যাপারে একত্রিত হয়েছে এবং দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্ব তৈরীতে সফল হয়েছে প্রহসনের কারণ দর্শানো ও শেষ দেখাতে।'

আমি শ্রীনগরের বেশিরভাগ সাংবাদিককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম না। তাদের সাথে আমার একমাত্র যোগাযোগ ছিল আমার লেখার মাধ্যমে। কিন্তু তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর। ১০ জুন ২০০২ তারিখে, আমার গ্রেফতারের খবর শোনার পরপরই তারা রাস্তায় ভিড় করে এবং আমার মুক্তি ও সঠিক তদন্ত দাবি করে। ভারতের অন্যপ্রান্তে বসে, কেউ শ্রীনগরে কোনো প্রতিবাদ পরিচালনায় যুক্ত থাকার ঝুঁকির কথা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু সকল ঝুঁকি নিয়ে সাহসের সাথে, আশিজনের একটি সংবাদকর্মীর দল রাজ ভবনের দিকে যাত্রা করে। অভিজ্ঞ সাংবাদিক ইউসুফ জামিল, নিজামুদ্দিন ভাট এবং আহমেদ আলি ফায়াজের নেতৃত্বে তারা গভর্নর গিরিশ চন্দ্র সাক্সেনার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানায়। তারা প্রায় প্রতিটি কেন্দ্র ও রাজ্য নেতার কাছে যায় এবং আমার নির্দোষিতার পক্ষে কথা বলে যদিও তারা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত না। আমার নির্দোষিতার ব্যাপারে তাদের এই আত্মবিশ্বাস ছিল আমার জন্য ব্যাপক মনোবল বৃদ্ধিকারী।

আদর্শগত বিষয়ে ছাপ ফেলার ব্যাপারে তরুণ বিজয় ছিলেন প্রতীকস্বরূপ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সংগঠন, পঞ্চায়ার সম্পাদক হিসেবে তার অবস্থান আমাকে সমর্থন দেয়ার পথে তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। আমার গ্রেফতারের কয়েক সপ্তাহ পরে যখন প্রচারণা তুঙ্গে উঠেছিল, তখন তিনি আমার বাবা ও স্ত্রীর জন্য আশা বয়ে এনেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন যে হতাশার সময় দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে কারণ তিনি জানতেন যে আমি ছিলাম নির্দোষ। তিনি বহুবার আদভানির দরজায় কড়া নেড়েছেন। যখনই আনিসা জান্দেওয়ালানে তার অফিসে তার সাথে দেখা করতে যেত তিনি তাকে সৌজন্য ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করতেন।

এমন গর্বের সময়ে আমার মন চলে যেত তিহারে গরাদের পেছনে পচে মরতে থাকা সেসব দুর্ভাগা বন্দিদের কাছে। তারা এমন সৌভাগ্যবান ছিল না যে প্রেসের মাধ্যমে তাদের বর্ণনা জনগণের কাছে পৌঁছে যাবে। তাদের অনেকেই কোনো দোষ করেনি। কিন্তু আমি যে সংঘের সাথে আছি তারা সেটায় নেই, এর মাঝে তাদের কোনো বন্ধুও নেই। তাদের পক্ষে অনুরোধ করার কেউ নেই। কিন্তু এটা সত্যি যে তাদের অনেকের দুর্দশা আমার সংঘের কাজ আর ভুলের কারণেই

জটিল হয়েছে। গরিব হতভাগ্যারা জানত না যে আমার সহকর্মীরা আশীর্বাদ না অভিশাপ।

আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রতিবেদন আর আর সমালোচনা করতে গিয়ে আমরা হয়তো মৌলিক আবেগ অনুভূতিকে ভুলে যাচ্ছি। আমাদের একটু বিশ্রাম নেয়া প্রয়োজন আর আমাদের প্রতিবেদনের নিহিতার্থ নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের জিজ্ঞাসা করা দরকার যে আকর্ষণীয় ডেডলাইন, হেডলাইন আর বাইলাইন তৈরীর পেছনে ছুটতে গিয়ে আমরা মোটাদাগে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারকে লঙ্ঘন করছি কিনা, আমাদের রুজু করা প্রতিবেদন কিছু নির্দোষ ব্যক্তিকে তাদের ঘটনা উপস্থাপনের সুযোগ না দিয়ে তাদের উপর দণ্ডাদেশের বোঝা বাড়িয়ে দিচ্ছে কিনা।

একদিন সকালে যখন আমাদেরকে কোর্টের দিন উপস্থিতির জন্য তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র কুমার তার অধীনস্থকে বলেন যে, আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ আছে। আমি তাকে বলার চেষ্টা করলাম যে কোর্ট থেকে এমন কোনো নির্দেশ নেই। কিন্তু জোরাজুরি আর প্রতিবাদের কোনো স্থান নেই কারাগারে। আমাকে চক্করে পাঠানো হলো শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য। একজন বন্দিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য দায়ী কর্মকর্তা আসেননি। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে আমি কঠিনভাবে কর্মকর্তাকে কারণ দর্শানোর জন্য বললাম।

ভাগ্যক্রমে, একজন সহকারী তত্ত্বাবধায়ক সেখানে আসেন এবং কী ঘটছে তা জানতে চান। কর্মকর্তারা বলল যে আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি যথেষ্ট সাহস জোগাড় করে সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে বললাম যে কোর্ট থেকে কোনো নির্দেশ আসেনি এবং কারা কর্মকর্তারা ভুল করছেন। তিনি আমাকে আমার পরোয়ানা দেখাতে বললেন এবং নিজেই সন্তুষ্ট হলেন যে সেখানে আদতে এমন কোনো নির্দেশ নেই। তিনি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট সহকারী তত্ত্বাবধায়কের কাছে এর ব্যাখ্যা চাইলেন। সহকারী তত্ত্বাবধায়ক দাবি করলেন যে তিনি এমন একটি সংবাদ প্রতিবেদন পড়েছেন যেখানে বলা হয়েছে যে কোর্টের কার্যক্রমের সময় আমার শৃঙ্খলাহীন হওয়ার আবেদন কোর্ট প্রত্যাখ্যান করেছে। সহকারী তত্ত্বাবধায়ককে তার বস তার প্রাপ্য দিয়েছিল।

পরদিন আমি জানতে পারলাম যে একটি হিন্দু পত্রিকায় আমাকে এস.এ.আর গিলানির সাথে গুলিয়ে ফেলে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিবেদক আমাদের দুজনের মামলার পার্থক্য নিয়ে মাথা ঘামাতে যাননি।

কিন্তু সকল ক্ষতিকর প্রতিবেদনের ভেতর মাতৃস্থানীয়া ছিল একটি নেতৃস্থানীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত একজন অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদকের সংবাদটি। তিনি লিখেন যে আমি আইএসআই এর সাথে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছি।

প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ৩৫ বছর বয়স্ক ইফতিখার গিলানি, হুরিয়াত হার্ডলাইনার সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জামাই, একটি সিটি কোর্টে স্বীকার করেছেন যে তিনি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার চর।' ১১ জুন প্রতিবেদনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, আমার পুলিশের রিমান্ড চেয়ে প্রথমবার কোর্টে উত্থাপনের পরদিন।

যদিও পত্রিকার কোর্ট সংবাদদাতা সঠিকভাবেই সেদিনের কার্যক্রম লিখেছে, অবশ্যই অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদকে প্রতিদিনকার পুলিশ ব্রিফিংয়ের পর 'এক্সক্লুসিভ' অফার করা হয়েছিল।

যেটা তাকে কোর্ট প্রতিবেদকের সংবাদের সাথে তার প্রতিবেদন ক্রস-চেক করতে দেয়নি। আমার উপর আরোপিত আরেকটি কাল্পনিক উদ্ধৃতি হচ্ছে, 'জিহাদের প্রতি আমার নিষ্ঠা ও প্রেরণা দেখে আমার শ্বশুর আমার প্রতি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তার কন্যাকে আমার কাছে বিয়ে দেন।' যেসব কর্মকর্তা আমার তদন্ত করেছিলেন তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেন যে, আমি অনেক আইএসআই চেনার কথা স্বীকার করেছি, যাদের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। সেসময় আমাকে আইবি বা দিল্লি পুলিশ কেউই প্রশ্ন করেনি। এটা সম্পূর্ণরূপে একটি দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রতিবেদন। সাংবাদিক সংঘকে দ্বিধান্বিত করার জন্য কিছু কুশলী আইবি কর্মকর্তা দ্বারা এটি করা হয়েছে।

সকল দিল্লি সংবাদপত্র সাধারণত বিকেলবেলা শ্রীনগরে পৌঁছাত। যাহোক, ১১ জুন ২০০২ এই অনিষ্টকর সংবাদবাহী পত্রিকা দ্রুতবেগে অল্প সময়ে শ্রীনগরে পৌঁছে গেল এবং তা মুষ্টিমেয় কিছু সাংবাদিককে বিতরণ করা হলো, যারা আমার মুক্তির এবং ন্যায় তদন্তের জন্য করা প্রচারণার সম্মুখভাগে ছিল।

প্রতিবেদনটি তাদের মিশনে বাধা দান করল। তারা ভাবল যে সব কিছু শেষ হয়ে গেছে কারণ আমি কোর্টের সামনে স্বীকারোক্তি দিয়েছি। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন কলামিস্ট এবং আইন বিশেষজ্ঞ এ.জি নূরানি এই সংবাদে এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে তিনি আমার স্ত্রী এবং বেদ ভাসিনকে মুম্বাই থেকে কল করলেন এবং তাদেরকে বললেন যে তক্ষুনি ইচ্ছাকৃত ভুলতথ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। এমনকি দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেলের কর্মকর্তারাও এই সংবাদের কারণে বিরক্ত হয়েছিল। তারা জানতে চাইল যে আমি এই অপরাধ বিষয়ক প্রতিবেদককে চিনি কিনা আর তার সাথে কথা বলেছি কিনা। আমি তার সাথে কোনো কিছু করার কথা অস্বীকার করলাম।

এই সংবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে আনিসা পত্রিকার সহকারী চেয়ারপার্সনের সাথে যোগাযোগ করল। তার কথা ধৈর্যসহকারে শোনা হলো এবং তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়া হলো। সংবাদের ক্ষতি উপলব্ধি করে, সহকারী চেয়ারপার্সন আশ্বস্ত করলেন যে পত্রিকাটি অসত্য স্বীকার করবে এবং পুরো সংবাদের সংস্করণ প্রকাশ করবে।

যদিও পত্রিকাটি ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল, অনেকেই এমন ছিল যারা প্রথম প্রতিবেদনটি পড়েছিল, অসত্য স্বীকার করাটা পড়েনি: ফলে সন্দেহের সূচ আমার উপর কয়েক মাস ঝুলে ছিল।

১০ জুন ২০০২ তারিখে একটি হিন্দি পত্রিকার শিরোনাম ছিল 'আয়কর অভিযানকালে গিলানির জামাইয়ের বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদ এবং কিছু স্পর্শকাতর দলিল পুনরুদ্ধার।' প্রতিবেদনটি করা হয় একই উদ্দেশ্যে। পরদিন একই পত্রিকায় সংবাদ আসে, 'গিলানির বাসায় অতিথিরা দামি গাড়ি করে আসত' এবং এটি আমার সততায় মারাত্মক কলঙ্ক লেপন করে। ১২ জুন একই পত্রিকার আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়, আমি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। এই পত্রিকা আমার আশেপাশে থাকা লোকজনের কাছে মিথ্যা সংবাদ আরোপ করে। আমি যে খুব ভোরে আমার স্টাডিতে কাজ করতাম সেটাও আমার বিরুদ্ধে যায় যেন এটি সকল সাংবাদিকদের ধ্বংসের কারণ নয় যে তারা ঘর থেকে তাদের সংবাদ পূর্ণ করবে।

আমার বন্ধুরা সম্পাদকের কাছে গিয়ে অসত্য সংবাদগুলো তার নজরে আনার জন্য বলে। সে বলে তার কাছে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ তথ্য আছে। যাহোক, সে এধরনের কষ্টকল্পিত সংবাদ প্রকাশ করা বন্ধ করে যখন আমার বন্ধুরা বলে যে তারা এই ব্যাপারে কোর্টে যাবে।

আরেকটি নেতৃস্থানীয় ইংরেজি পত্রিকা লিখে:

ইফতিখার গিলানি, কারাদণ্ড প্রাপ্ত হুরিয়াত নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানির জামাই, ছিলেন পাকিস্তান ভিত্তিক সন্ত্রাসী দল হিজাব-উল-মুজাহিদীন এর চিফ-ইন-কমান্ডার মুহাম্মদ ইউসুফ আলি সৈয়দ সালাহউদ্দীনের দিল্লি ভিত্তিক পয়েন্ট ম্যান। দিল্লি পুলিশের তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থার গতিবিধি সম্পর্কে তিনি সালাহউদ্দীনকে উচ্চতর তথ্য সরবরাহ করতেন। তিনি তার সাংবাদিক পরিচয়ে তার আসল উদ্দেশ্য আড়াল করেছেন এত নিখুঁতভাবে যে নিরাপত্তা সংস্থার কয়েক বছর লেগেছে তার পরিচয় বের করতে, নিষ্ঠাবান সূত্র জানায়...

তিনি স্পষ্টভাবে হুরিয়াত মিশ্রণের বিরুদ্ধে কথা বলেন এবং এমনকি এর নেতৃত্বের সমালোচনা করে নিবন্ধও লিখেন। এটি ছিল ইনটেলিজেন্স ও নিরাপত্তা সংস্থাকে ফাঁকি দেয়ার চতুর কৌশল।

তিনি এখানে সংবাদকর্মীদের যে স্বাধীনতা ও প্রবেশাধিকার দেয়া হয় তার অপব্যবহার করেছেন। সংস্থাগুলোর দীর্ঘ সময় লেগেছে তাকে ছো মারতে কারণ তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদদাতার সুরক্ষা আবরণ উপভোগ করেছেন।

১১ জুন ২০০২ একটি হিন্দি পত্রিকায় আমার স্ত্রীর একটি ছবি ছাপায় যে সে স্পেশাল সেলে আমার সাথে দেখা করে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম দাবি করে, 'ইফতিখার গ্রেফতার, স্ত্রী আনিসা পালাচ্ছেন।'

প্রায় সকল পত্রিকা আমার বাসা থেকে একটি ল্যাপটপ পুনরুদ্ধারের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আমার নিজস্ব কোনো ল্যাপটপ ছিল না। আসলে এমনকি পুলিশও আমার বাসা থেকে ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করার দাবি কখনও করেনি।

কিন্তু কেউই মনে হয় এসব সাজানো সংবাদের ব্যাপারে প্রশ্ন করেনি—আর কীভাবে তারা বিশ্বাস করত যে আমি ছিলাম দুটি পাকিস্তানি পত্রিকা দ্য নেশন এবং দ্য ফ্রাইডে টাইমসের আবাসিক সম্পাদক। ভারতে থেকে পাকিস্তানি

প্রকাশনার আবাসিক সম্পাদক হওয়া সম্ভব নয়। যেখানে আমাদের প্রিন্ট মিডিয়ায় সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি নেই, একজন আবাসিক সম্পাদকের নিয়োগ করার মানে হচ্ছে পত্রিকাটি ভারত থেকে প্রকাশিত। এবং কীভাবে একজন ব্যক্তি একই জায়গা, যেটা হলো লাহোর, থেকে প্রকাশিত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রকাশনার জন্য কাজ করতে পারে।

তিহারে সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ছিল দৈনিক জাগরণ। আমি ক্লাসের পরে ভীত হয়ে থাকতাম যখন বন্দিরা দৈনিক জাগরণের উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদগুলো পড়ত। ওয়ার্ডার, মুন্সী এবং অভিযুক্তরা আমাকে নিয়ে করা খবরগুলোয় নির্দেশ করত এবং এর ব্যাখ্যা জানতে চাইত, আর তারপর আমার বলা কথাগুলো মিথ্যা হিসেবে বাতিল করে দিত এবং আমাকে শাস্তি দিত। আসলে আমার ভর্তির দিন আমাকে যে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা মোটাদাগে পত্রিকার ভুলপ্রতিবেদনের জন্য। কে আমাকে বিশ্বাস করবে যখন সে সাদা-কালোয় সেটা দেখছে? তাদের কাছে ছাপানো শব্দ, বিশেষ করে তা যদি দৈনিক জাগরণে ছাপা হয়, সেটাই অকাট্য সত্য।

যদি সংবাদ প্রতিবেদনগুলো বিশ্বাস করতেই হতো, আমার ছিল বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা, ছিলাম কিছু ওয়াল মিডিয়া প্রোডাকশনের মালিক, তের লাখ রুপিতে কেনা তিন-বেডরুমের একটি ফ্ল্যাট, ২.২ মিলিয়ন রুপির অপ্রদর্শিত সঞ্চিত অর্থ, এবং ৭.৯ মিলিয়ন রুপির আয়কর ফাঁকি দিয়েছি, আর নিয়মিত নিজের একাউন্ট ও বেনামে বিপুল জমা করেছি। এসব উদ্দেশ্যপ্রণোদিত খবর আমার দুর্দশা আরও জটিল করে দিত।

এসব নিয়ে ভাবলে, আমার মিডিয়াকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত আমার কম্পিউটারে অভিযুক্ত দলিল পাওয়ার খবরটা আমাকে জানানোর জন্য। আমার বাসায় অভিযান চলাকালে অভিযান দলের একজন সদস্য টেলিভিশনের সুইচ অন করলে আমি সর্বপ্রথম এ ব্যাপারে জানতে পারি। বিভিন্ন সংবাদ চ্যানেল তাদের মতো করে সংবাদ পরিবেশন করছিল। আজ তাকের মতে, আমি বাসা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম। জি বলছিল, আমার স্ত্রী পালিয়ে যাচ্ছিল। দূরদর্শন ঘোষণা দিয়েছিল যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

এনডিটিভি পুরোপুরি যৌক্তিক ছিল। আজ তাক ফ্ল্যাশ করছিল যে আমার ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে কিছু স্পর্শকাতর প্রতিরক্ষা দলিল পাওয়া গেছে।

সকল প্রতিবেদক প্রতিবেশী আর দর্শকদের কাছ থেকে তাদের অনুকূলে মন্তব্য পাওয়ার চেষ্টা করছিল, যাদের মন্তব্য তাদের সংবাদে আরও মালমসলা যোগ করবে। তাদের একজন ভ্যান্ডেরা নামে আমাদের এক প্রতিবেশীকে ম্যানেজ করে ফেলে যে এখন আমাদের থেকে অনেক দূরে থাকে। সে সোসাইটিতে দেখতে এসেছিল যে কী ঘটছে। সেই প্রতিবেশী প্রতিবেদকদের বললেন যে তিনি তাদেরকে আমাদের ব্যাপারে কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য দিতে পারবেন। যখন একজন প্রতিবেদক তাকে আমাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, সে উত্তর দিল যে তার দিল্লিতে চৌদ্দ বছর থাকাকালীন সময়ে আমরা ছিলাম তার শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী। তাকে সোজাসুজি সরিয়ে দেয়া হলো আর বলা হলো যে সে বিশ্বাসঘাতককে আড়াল করে দেশের অপকার করছে।

আমার মুক্তির পরও আমার কিছু সহজ সরল মিডিয়া বন্ধু যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদের জট পাকিয়েছিল, তারা আরও একবার প্রলোভনে পড়ে গেল আর তাদেরকে লিখতে প্ররোচিত করা হলো যে আমার বিরুদ্ধে কিছু নতুন প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রমাণটি ছিল যে আমি পঞ্চাশবার পাকিস্তান হাই কমিশন পরিদর্শন করেছি, দিল্লির পশ ভিসেন্ট কুঞ্জ এলাকায় আমার আরেকটি ফ্ল্যাট আছে, এবং আমি 'অনেক বেশি পরিমাণ' বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করেছি। এসব সংবাদ একটি প্রখ্যাত দৈনিকের নিউজডেস্কে পৌঁছে গিয়েছিল। সম্পাদক সেটা ক্রস-চেক করে বাদ দেয়।

প্রেসে আমার গ্রেফতার বিষয়ক আরেকটি বিপর্যয় আর নেতিবাচক প্রচারণা ছিল প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো স্বেচ্ছাচারি হয়ে আমার স্বীকৃতি বাতিল করে। আমি কারাগারে থাকা অবস্থায় দৈনিক জাগরণে এই খবর পড়ি। যাহোক, জনপ্রিয় মারাঠি দৈনিকের চিফ ব্যুরো ভি.পি নাইকের সভাপতিত্বে লোকসভা প্রেস কমিটি আমার পাশে দাঁড়ায় এবং বিষয়টি চালিয়ে যায়।

এমনকি আমার মুক্তির এক সপ্তাহের ভেতর আমার লোকসভা স্বীকৃতি পুনরুদ্ধার করা হয় যেটা স্থগিত হয়ে ছিল। সংসদ সদস্য আবদুর রশীদ শাহীনের প্রশংসনীয় কার্যক্রমকে ধন্যবাদ জানাই যিনি লোক সভা স্পীকার মনোহর জোসির সাথে কথা বলেছিলেন। শিবসেনার সদস্য হওয়া সত্ত্বেও স্পীকার ছিলেন সহানুভূতিশীল। কিন্তু প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো নিজেই আমার স্বীকৃতি ফিরিয়ে দিতে সময় নিয়েছিল।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিখেছি যে অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদনের জন্য নতুন উপায় এবং সংস্কৃতি তৈরী হওয়া দরকার। অপরাধ জগতের জন্য শিশুসুলভ প্রতিবেদক পাঠানো আর তাদের কাছ থেকে আকর্ষণীয় খবর পাওয়ার আশা করাটা অন্যায়। যদি তাদের উপর চাপ থাকে তাহলে পুলিশের সাথে বন্ধুত্ব করে তথ্য ফাঁস, ভিন্নধর্মী আর এদিক সেদিক থেকে খবর জোগাড় করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই সুবিধা ভোগের জন্য তাদের মূল্যও দিতে হয়, পুলিশ আর তদন্ত সংস্থা যেমন বলে তাদের তাই লিখতে হয়। যেহেতু সবসময় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের ঘটনা জানা সম্ভব না, তাই পুলিশ যদি তাদেরকে নিজেদের মতো করে চালানোর চাইতে প্রকৃত তথ্য দিত তাহলে সেটা সাহায্য করার মতো হতো। কিছু পত্রিকা অন্য পক্ষ থেকে বিবরণ না পেলে 'লিক' এর উপর কোনো প্রতিবেদন না ছাপানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নিয়েছে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত মিডিয়ারও এই পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এখানে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবাদিকতার জনক, মুলক রাজ সরাফের গুরু, রতন মোহন লালের চাতুর্যপূর্ণ উপদেশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। লাল এই জ্ঞানী উপদেশগুলো সরাফকে বলেছিল ১ জুলাই ১৯২৪ সালে যখন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রথম পত্রিকা, রণবির চালু করা হয়। তিনি বলেন,

"রণবির বের করায় আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই। এই ছোট প্রতিষ্ঠানটি একদিন অনেক বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এবং এর বর্ধনে তুমি তোমার অখণ্ড মনোযোগ দিতে সচেতন হবে না। তুমি তোমার লেখাকে আদর্শিক করার চেয়ে আন্তরিক করো, প্রয়োগিক করার চেয়ে বাস্তবিক করো এবং অতি সূক্ষ্ম সমালোচনার চেয়ে সহানুভূতিশীল করো। আর নিজেকে অতিরিক্ত রাশভারী, আড়ম্বরপূর্ণ আর কর্তৃত্বপরায়ণ করার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করো। তোমার নোটে হাস্যরস আনো, সেগুলোকে কোমল করো কিন্তু ফালতু বানিও না। সবসময় আইন, আদেশ এবং নিয়মতান্ত্রিকতার পক্ষে থাকো। তোমার ধরন হবে তেজস্বী তবে অতিরঞ্জিত নয়, সাধারণ কিন্তু শুষ্ক নয়, স্পষ্ট কিন্তু ঘোরালো নয়। একে সাধাসিধা আর আড়ম্বরের মাঝে আঘাত করতে দাও। ফালতু শব্দকে উত্তেজনাকর হিসেবে ব্যবহার করো না, কথাবার্তার নতুন শব্দকে পক্ষপাতমূলক হিসেবে ব্যবহার করো না। তোমার যুক্তির উপরে আবেগকে স্থান দিও না। একটি কলমের খোচায় তুমি পৃথিবীর মন্দকে দূর করতে পারবে না, সেটা যতই তেজস্বী

হোক না কেন। কঠিন সত্যের ক্ষেত্রে আদর্শের অবাস্তব স্বর্গরাজ্য থেকে অবতরণ করতে ভুলো না। তোমার সমালোচনাকে তিক্ত বা একপেশে করো না—আমাকে তোমার প্রচারকের ভূমিকায় আসার দরকার নেই। তোমার যোগ্যতা, জনসাধারণের চেতনা আর তোমার উদ্দেশ্যের কঠিন সততা তোমাকে সাংবাদিক জীবনে চরমাবস্থার পর্যায়ে পৌঁছে দেবে।"

এর চেয়ে ভালো উপদেশ আর সম্ভব নয়।

সাত

আইন ও তার অপব্যবহার

ওএস অ্যাক্ট, ১৯২৩ হচ্ছে একটি কঠোর আইন সংক্রান্ত আইন। এর অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কোনো রক্ষাকবচ নেই। তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত আইন হওয়ায় এটি বহু আগেই এর প্রচার হারিয়েছে। এখন মামলায় এই আইনের অধীনে কিছু ছোড়াছুড়ি আছে তাই এবার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা প্রয়োজন।

আমার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ ২২৫ পৃষ্ঠারও বেশি দলিল ছিল অভিযোগপত্রে।

অভিযোগপত্রে সংযুক্ত প্রমাণের বিশ্লেষণ করার আগে, ইন্ডিয়ান প্যানাল কোড ও অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের প্রসঙ্গিক শর্তাবলি আলোচনা করা যথোচিত হবে।

আমি ওএস অ্যাক্টের ৩ ও ৯ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত ছিলাম, সাথে ছিল আইপিসি এর ১২০-বি ধারা। এই ধারাটি কেবলমাত্র অপরাধের সংজ্ঞা নির্ধারণেই অস্পষ্ট ছিল না, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের অনুমোদনও দেয় এবং সংশ্লিষ্ট কোর্টে যতদূর সম্ভব অপরাধ প্রমাণও করে।

ওএস অ্যাক্টের ৩ নাম্বার ধারা মেনে চলে যে, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হবে যদি, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজের উদ্দেশ্যে এগোয়, পরিদর্শন করে বা অতিক্রম করে অথবা কোনো নিষিদ্ধ জায়গার কাছাকাছি যায় বা প্রবেশ করে অথবা এমন কোনো স্কেচ, মডেল, প্লান তৈরী করে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শত্রুর জন্য উপকারী বলে বিবেচিত হয় বা হতে পারে বা হওয়ার আশংকা থাকে অথবা কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো গোপন অফিসিয়াল কোড বা পাসওয়ার্ড বা কোনো স্কেচ, প্ল্যান, মডেল বা নোট বা অন্য কোনো দলিল বা তথ্য যা কোনো শত্রুর জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপকারী বিবেচিত হতে পারে, বা হওয়ার আশংকা থাকে এমন কিছু অর্জন করে, সংগ্রহ, রেকর্ড বা প্রকাশ বা কোনো ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ বা এমন কোনো ব্যাপারের সাথে সংযুক্ত থাকে যার প্রকাশ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার

জন্য, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা বিদেশি রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

এই ধারা আরও প্রস্তুত করে যে যদি অপরাধের সাথে দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপার যুক্ত থাকে তাহলে সাজা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে যেখানে অন্য ক্ষেত্রে এর শাস্তি তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে।

আইনটি রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের কোর্ট অব ল'তে অভিযোগ প্রমাণের বোঝা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেয় যেহেতু ৩ নাম্বার ধারা বলে, এটা দেখানো দরকারি নয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট অ্যাক্টে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর কাজের জন্য দোষী।

আইনটি কোনো অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট অ্যাক্ট প্রমাণের প্রয়োজনীয়তাকে সরবরাহ করে, এবং বলে যে সে দোষী সাব্যস্ত হবে যদি এটা প্রমাণিত হয় কঠিন প্রমাণের দ্বারা নয় বরং অবস্থাগত প্রমাণের দ্বারা যে উদ্দেশ্যটা ছিল অথবা প্রতীয়মান হয়েছে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর।

৯ নাম্বার ধারা অ্যাক্টের অধীনে অপরাধের দালালির প্রচেষ্টা বা প্রবর্তনা নিয়ে আলোচনা করে। এর মানে হচ্ছে যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে এসব অপরাধ না করে তবুও সে প্রচেষ্টা বা প্রবর্তনার জন্য দোষী হবে। এবং শুধুমাত্র প্রচেষ্টা বা প্রবর্তনার শাস্তি অপরাধ করার মত শাস্তির সমতুল্য।

ওএস অ্যাক্টের অধীনে অপরাধের এসব অস্পষ্ট সংজ্ঞার নিহিতার্থ যথাযোগ্যভাবে নির্দেশ করা হয়েছে চঞ্চল সরকারের 'চ্যালেঞ্জস এন্ড স্টেগনেশন' বইতে। চঞ্চল বলেন, 'ওএসএ এর ভাষা অপরাধমূলক অপরাধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট চওড়া হোম অফিসের একজন বার্তাবাহকের জন্য একজন প্রতিবদেককে জানাতে যে আন্ডার সেক্রেটারি চায়ের মধ্যে ছয় লাম্প চিনি নেয়ার অভ্যাস আছে।

আইপিসি এর ১২০-বি ধারা একটি অপরাধ সংঘটনের অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রকে বোঝায়। ১২০-এ ধারায় অপরাধের ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, 'যখন দুই বা ততধিক ব্যক্তি কোনো বেআইনি কাজ করে বা করার কারণ হয়, বা এমন কোনো কাজ করে যা বেআইনি নয়, বেআইনি উপায়ে, এ ধরনের সম্মতি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত।' এর সংজ্ঞা দ্বারা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের জন্য দুই বা ততোধিক ব্যক্তি প্রয়োজন' বেআইনি

কোনো কাজ করার জন্য। আমার মামলায় আমি শুধুমাত্র একজন অভিযুক্ত ছিলাম। অপরাধ সম্পাদনের কোনো উল্লেখই ছিল না।

অভিযোগপত্রে আইপিসির ২৯২ ধারা পর্ণগ্রাফির সাথে যুক্ত। অভিযোগটি মামলার নিবন্ধনের প্রায় একমাসেরও বেশি সময় পরে দেয়া হয়, কিছু স্প্যাম ই-মেইল আর ভিসিডির ভিত্তিতে। ৯ জুন ২০০২ তারিখে আয়কর ডেপুটি ডিরেক্টর সৌরভ কুমারের দায়েরকৃত অভিযোগে ভিসিডি উদ্ধারের কোনো উল্লেখ ছিল না। অভিযুক্ত ভিসিডির সংখ্যা ছিল এগারোটি। এ্যান্টি-পর্ণগ্রাফি আইনের অধীনে অভিযোগ দায়েরের অন্য ভিত্তি ছিল কিছু ই-মেইল যেগুলো আমার ই-মেইল একাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। যারা ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত তারা জানেন যে স্প্যামিং একটি বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক। যেহেতু আমার ই-মেইল আইডি ছিল কাশ্মীর টাইমসের দিল্লি ব্যুরোর অফিসিয়াল আইডি, এটি এর প্রিন্টলাইনে প্রতিদিন আসত আর জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য ছিল। আমি এই কারণে আমাকে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন বুঝতে পারিনি, একটি জামিনযোগ্য অপরাধ, যখন ওএস অ্যাক্টের অধীনে আমাকে গ্রেফতার করে দীর্ঘ সময় গরাদের পেছনে আটকে রাখা নিশ্চিত হয়ে গেছে।

দি পিপলস ইউনিয়ন ফর ডেমোক্রেটিক রাইটস (পিইউডিআর) আমার আটকের উপর 'ফ্রিডম ফেটারড' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটি পুলিশের মূলনীতি ব্যাখ্যা করে: 'অশ্লীলতার অভিযোগটি একজন ব্যক্তি হিসেবে গিলানির নৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতার উপর প্রশ্নবোধক চিহ্ন একে দেয়, এটা দেখানোর চেষ্টা করে যে কাশ্মীরি মুসলিম যে কিনা 'জাতীয়তা-বিরোধী' সে 'নৈতিকভাবেও দুশ্চরিত্র'—সে শুধু পর্ণগ্রাফি দেখেই না; সে অন্যদেরকে অবক্ষয়ের দিকে আমন্ত্রিত ও প্ররোচিতও করে।'

ওএস অ্যাক্টের অধীনে গোয়েন্দাগিরির অভিযোগের মূল ভিত্তি ছিল আমার কম্পিউটার থেকে উদ্ধারকৃত একটি দলিল। যেটা আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, দলিলটি ছিল মূলত ইনস্টিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান এর ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা একটি গবেষণা পত্রের সংযুক্তি। পুরো দলিলটি ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৯৬ সালে বুকলেট আকারেও প্রকাশিত হয়। বুকলেটটি বিভিন্ন সরকারি ও বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। সংযুক্তিটি একটি প্যারিস-বেইজড প্রায় ১১৫টি হিউম্যান রাইটস গ্রুপে মিলে

গঠিত লা ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনালে দেস দ্রোইটস আই'হোমে থেকে উৎসারিত।

আইবি কর্মকর্তারা এই দলিলটি আমার শ্বশুর সৈয়দ আলি শাহ গিলানির উপরও চাপিয়ে দেয় আর আমাদের মাঝে এক ধরনের যোগসূত্র আছে বলেও প্রমাণের চেষ্টা করে। তারা কাশ্মীরেও মামলা নিবন্ধন করে এবং একটি মামলা করার চেষ্টা করে যে দেখানোর মতো এমন প্রমাণ আছে যে এই উপত্যকায় এমন 'ইনপুট' গ্রহণকারী ব্যক্তি একমাত্র আমিই এবং তারপর নিউ দিল্লির পাকিস্তান হাই কমিশনে আইডেন্টিফাই ইনটেলিজেন্স অপারেটিভসে পাঠিয়ে দেয়।

ডিজিএমও এর মতামতে বলা হয়:

ক) দলিলের ধরন

১) দলিলটি নর্দান কমান্ডে মোতায়েনকৃত ওআরবিএটি (অর্ডার অফ ব্যাটল) আর্মি, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং প্যারা মিলিটারি ফোর্সেস (জে & কে) এর বিস্তারিত। বিশেষ শব্দে, এটি জে & কে-তে মোতায়েনকৃত আর্মি সৈন্যবিন্যাস এবং ইউনিটের অবস্থান, অবস্থা এবং শক্তির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় রাইফেলস এবং প্যারা মিলিটারি ফোর্স ব্যাটালিয়ন এর বিশাল এলাকায় সৈন্য মোতায়েন সম্পর্কে জানায়।

২) এটি সুনির্দিষ্টভাবে আর্মি থেকে উৎসারিত কোন দলিল নয়। এর মধ্যে আছে বিশেষভাবে সৈন্যদলের শক্তি ও অবস্থান পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন করার কাজে নিযুক্ত একজন প্রতিনিধির সংগৃহীত তথ্য।

খ) দলিলের নিরাপত্তা মূল্য। দলিলে বিদ্যমান তথ্য দেশের নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর। এবং জে& কে-তে আমাদের অপারেশনাল পরিকল্পনা নিয়ে এতে গুরুত্বপূর্ণ শাখা-প্রশাখা রয়েছে।

গ) শত্রু দেশের জন্য তথ্যের কার্যকারিতা। দলিলে বিদ্যমান তথ্য আমাদের শত্রুর জন্য সরাসরি উপকারী।

ঘ) দেশের প্রতিরক্ষার সাথে দলিলের সম্পর্ক। দলিলে বিদ্যমান তথ্য আমাদের দেশের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সরাসরি যুক্ত।

পুলিশও একটি স্মারকলিপি প্রকাশ করে। এই স্মারকলিপি অনুসারে, আমি তাদেরকে বলেছি যে, হুরিয়াত কনফারেন্স নেতা সৈয়দ আলি শাহ গিলানি আমার

এই বিশ্বাসে যে পাকিস্তানের জড়িত হওয়া ছাড়া কাশ্মীর সমস্যা সমাধান সম্ভব নয়, এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে তিনি তার কন্যাকে আমার সাথে বিয়ে দেন; বলেছি যে ১৯৯৭ সালে জুলাই মাসে একজন আইএসআই প্রতিনিধি আমার সাথে শ্রীনগরে সাক্ষাৎ করেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য আমাকে মোটা অঙ্কের অর্থ অফার করেন; এবং বলেছি যে আমি আইএসআই-কে দেয়ার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের উপর তথ্য সংগ্রহ করছি।

অভিযুক্ত দলিলের প্রকাশিত সংস্করণ গ্রহণের পর তারা একটি পরিপূরক স্মারকলিপি প্রকাশ করে। এই স্মারকলিপি আবারও আমার উপর সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবৃতি আরোপ করে। এতে বলা হয় যে আমি দলিলে বিদ্যমান তথ্য একজন প্রতিবেদকের ছদ্মবেশে বিভিন্ন অফিস ঘুরে সংগ্রহ করেছি এবং আমার সাথে দেখা করতে আসা বিভিন্ন আইএসআই প্রতিনিধিদের এসব তথ্য সরবরাহ করেছি, এবং বলা হয় যে পাকিস্তান সরকার আমার সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে এই দলিলটি প্রস্তুত করেছে।

আয়কর কর্মকর্তারা, যাদেরকে মামলায় অভিযোগকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে তারা বলেন যে, আমার কম্পিউটারের ফাইলটি ১৭ অক্টোবর ২০০১ তারিখে তৈরী করা হয়েছে। পুলিশ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকাশিত স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, আমি ১৯৯৭ সালে শ্রীনগরে একজন আইএসআই প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাৎ করি এবং তারপর তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করি। এতে আরও বলা হয়, পাকিস্তান সরকার আমার সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে এই দলিলটি ১৯৯৫ সালে প্রকাশ করে যদিও আমার কম্পিউটারে ফাইলটি মাত্র ২০০১ সালে প্রস্তুত করা হয়েছে।

অভিযোগপত্রে আমার টেলিফোন ডায়রির একটি ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়েছে এটা দেখানোর জন্য যে আমার সাথে পাকিস্তান হাই কমিশনের গভীর যোগাযোগ রয়েছে। দুটি সম্মানিত পাকিস্তানি পত্রিকা দ্য ফ্রাইডে টাইমস এবং ডেইলি টাইমস, কাশ্মীরের একটি শ্রদ্ধাভাজন এবং ব্যাপক প্রচারিত সংবাদপত্র দ্য কাশ্মীর টাইমস এবং রেডিও ডয়চে ভেলের সাংবাদিক হিসেবে পাকিস্তান হাই কমিশনের প্রেস সেকশনের টেলিফোন নাম্বার থাকাটা কি অস্বাভাবিক? হাই

কমিশনের সাথে আমার কোন 'গভীর যোগাযোগ' নেই, কিন্তু হ্যাঁ, আমার পেশাদারী যোগাযোগ আছে এবং সেটা সম্পূর্ণরূপে আইনানুগ।

অভিযোগপত্রে আমার পাকিস্তানি যোগাযোগের প্রমাণ হিসেবে দ্য নেশনের সহকারী নির্বাহি সম্পাদককে করা আমার একটি ই-মেইল সংযুক্ত করেছে যেটাতে পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি জেনারেল পারভেজ মুশাররফের পরিদর্শনকালে আগ্রা, মুঘল শেরাটনে তার থাকার ব্যাবস্থার কথা জানিয়েছিলাম।

আমার এবং আমার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত বিস্তারিত অভিযোগপত্রে সংযুক্ত করা হয়েছে। তাদের মাঝে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আমার সকল আয় ছিল স্পষ্ট। তারা অভিযোগপত্রে যা অভিযুক্ত করেছে তা ছাড়া অনুসন্ধান চলাকালে আমার বাসায় প্রাপ্ত রুপি ছিল মাত্র ৩৪৫০।

মজার ব্যাপার হল, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা কোর্টে কিছু ব্যাংক একাউন্টের বিস্তারিত উপস্থাপন করে বলেছে যে সেগুলো আমার। যখন আমি সেগুলো আমি দেখলাম, আমি তাৎক্ষণিকভাবে একটি তদন্ত দাবি করলাম। এতে, সেসব অভিযোগ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার-৩৩৪৮৪১৬ ছিল জনৈক রুমাইসা গিলানির নামে, কনাট প্লেসে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড গ্রিন্ডলে ব্যাংকে, এতে আছে ১৫ মিলিয়ন রুপি, একাউন্ট নাম্বার-২৯২২৪২০২ ছিল ডেভেলপমেন্ট ক্রেডিট ব্যাংকে, কনাট প্লেসে, জনৈক ইমতিয়াজ গিলানির নামে, এতে ছিল ১৪ মিলিয়ন রুপি। তারা বসন্ত কুঞ্জে আমার নামে একটি ফ্ল্যাটেরও কিছু ভূয়া কাগজপত্র উত্থাপন করে।

অভিযোগপত্রে এসব বিস্তারিত দাখিল করা হয়নি। কিন্তু সেগুলো আমার মুক্তির পরও সাংবাদিকদের মাঝে প্রচার করা হয়েছে, এই দাবি করে যে আইবি আমার বিরুদ্ধে নতুন প্রমাণ পেয়েছে। তারা প্রতিজ্ঞা করে যে আমার স্বাধীনতা হবে স্বল্প সময়ের।

অভিযোগপত্রে দোষারোপ করা হয় যে রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশাররফের আগ্রা পরিদর্শনকালে আমি পাকিস্তান সরকারের আতিথেয়তা উপভোগ করেছি। অভিযোগপত্রে সংযুক্ত করা মুঘল শেরাটনের লবি ম্যানেজারের বক্তব্যই এর যুক্তিকে অস্বীকার করে। লবি ম্যানেজার বলেছে যে রুমের ভাড়া পরিশোধ করেছিল দোস্ত মুহাম্মদ ইউসুফি, যিনি ছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেস অফ

পাকিস্তান (এপিপি) এর ভারত-ভিত্তিক বিশেষ সংবাদদাতা। আসলে আমি ইউসুফের সাথে অবস্থানও করিনি।

আমি আগ্রা গিয়েছিলাম প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশাররফের মধ্যকার শীর্ষ সভাটি কভার করতে। কাশ্মীর টাইমস ট্রাস্টের সভাপতি বেদ ভাসিনও সেখানে গিয়েছিলেন যেহেতু তাকে পারভেজ মুশাররফের সাথে সকালের নাস্তা করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তার থাকার আয়োজন করা হয়েছিল ভারতের বৈদেশিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে। কাশ্মীর টাইমস এর নামে বুক রুমে তার সাথে আমার থাকার কথা ছিল।

যদিও পারভেজ মুশাররফের পরিদর্শনের পরিকল্পনা ছিল দুইদিন কিন্তু শীর্ষ সভার আলোচনা হওয়ার পরিকল্পনা ছিল মাত্র একদিন। পরেরদিন পারভেজ মুশাররফের নেতৃস্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে সকালের নাস্তা করে আজমির যাওয়ার কথা ছিল। সুতরাং শীর্ষ সভা একদিন ছিল সাংবাদিক ও সংবাদদাতাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি হোটেল মুঘল শেরাটনের যে জায়গায় ভারত ও পাকিস্তানি উভয় মিডিয়ার লোকজন অবস্থান করছিল যেখানে পৌঁছাই। সেখানে একটি মিডিয়া সেন্টারও স্থাপন করা হয়েছিল।

কিন্তু শীর্ষ সভাটি পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোয়নি। তথ্য ও সম্প্রচার বিষয়ক ইউনিয়ন মন্ত্রী সুষমা স্বরাজের একটি বক্তব্য পাকিস্তানি ক্যাম্পে আলোড়ন তৈরী করে। পাকিস্তানি প্রতিনিধির এই বক্তব্যে প্রতিক্রিয়া জানানোর কথা। বিতর্ক চলে শেষ রাত পর্যন্ত এবং পাকিস্তানিরা তাদের প্রতিক্রিয়া জানায় প্রায় ২:০০ টার দিকে। কাশ্মীর টাইমসের জন্য আমার সংবাদ নথিভুক্ত করতে ৪:০০ টা বেজে যায়। ইউসুফি পরামর্শ দেন যে আমাকে হোটেলেই তার রুমে থেকে যেতে যেহেতু পারভেজ মুশাররফ সকালে সম্পাদকদের জন্য নাস্তার আয়োজন করেছে আর এর ফলে আমি অংশগ্রহণকারী সম্পাদকদের মন্তব্য পেতে পারব।

আমরা জানতাম না যে মিটিংটি সম্প্রচার করা হবে।

যেহেতু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল তাই আমি ভাবলাম যে বেদ ভাসিনকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না। তাই আমি ইউসুফির সাথে যাই আর তিন থেকে চার ঘন্টা তার সাথে থাকি। ইতিমধ্যে একজন হোটেল কর্মচারী আমার নাম লিখে নেয় আর এই ছিল সেই ব্যাপার। আমি পরদিন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

একে কি বলা যায় 'পাকিস্তান সরকারের আতিথেয়তা উপভোগ করেছি?'

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা ১০,০০০ হাজারেরও বেশি ই-মেইল স্ক্যান করেছে তাদের কিছু প্রমাণ খুজে পাওয়ার প্রচেষ্টায় যেগুলো তাদের ম্যাড়মেড়ে মামলায় খাড়া করানো যেতে পারে।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা অভিযোগ করে যে আমি কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে। এই যুক্তি সমর্থন করতে প্রকাশিত স্মারকলিপি উত্থাপনের পাশাপাশি তারা আমার গ্রহণ করা একটি ই-মেইল যুক্ত করে দেয়। এই ই-মেইলের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হয় যে আমি কাশ্মীরে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা পাকিস্তানি নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহ করছি।

ই-মেইলটি পাঠিয়েছিলেন আবদুল হামিদ খান যিনি বেলুচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতি এবং এটা আসলে ছিল ইউনাইটেড নেশনস কমিশন ফর হিউম্যান রাইটস এ দাখিলকৃত স্মারকলিপির একটি কপি। পাকিস্তান পরিচালিত কাশ্মীরের গিলগিট এলাকার মানবাধিকার পরিস্থিতির বিস্তারিত জানিয়ে স্মারকলিপিতে বলা হয়:

দ্রুতবেগে অধোগামী মানবাধিকারের দিকে আমি এই ফোরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের জাতি পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী এবং এর কুখ্যাত ইনটেলিজেন্স সংস্থা আইএসআই এর দমবন্ধ করা নিয়ন্ত্রণে আছে। আমাদের নির্দোষ লোকেদের সাথে পরাধীন দাসের মতো ব্যাবহার করা হচ্ছে। বিগত ৫২ বছর যাবত তারা সব ধরনের মানবিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এর ফলে আমাদের সাধারণ লোকদের সাথে প্রাণীর চেয়ে খারাপ ব্যাবহার করা হচ্ছে।

পাকিস্তানি প্রশাসন এবং এর কুখ্যাত ইনটেলিজেন্স সংস্থা আইএসআই, নির্দোষ বেকার যুবকদের এলওসির মধ্য দিয়ে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও ধর্মীয় সাফাইয়ের নামে জোরপূর্বক ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পাঠানো হচ্ছে।

স্মারকলিপিতে এমন সাতাশজন যুবকের নাম ও ঠিকানা দেয়া হয় যাদেরকে আইএসআই এলওসির মধ্য দিয়ে পাঠিয়েছিল এবং ১৯৯৮/৯৯ সালে তাদেরকে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী হত্যা করে। পাশাপাশি, স্মারকলিপিতে এমন আরও নয়জনের নাম দেয়া হয় যারা 'ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীররের কন্ট্রোল লাইন অতিক্রম করতে অস্বীকার করে, তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং আইএসআই

ও তাদের মুখপাত্র জামায়াত-ই-ইসলামি কর্তৃক কন্ট্রোল লাইনের সামনে হত্যা করা হয়।'

স্মারকলিপিটি 'বেলওয়ারিস্তানের (গিলগিট বেলুচিস্তান অধ্যুষিত) ২ মিলিয়ন নিপীড়িত মানুষের পক্ষে 'আবেদন করে যে সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রপতি রফিক তারার, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল পারভেজ মুশাররফ, জেনারেল জিয়াউদ্দিন, এবং তৎকালীন আইএসআই প্রধান জেনারেল মুহাম্মদ আজিজকে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের সামনে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে আনা হোক।

উপরেল্লেখিত ই-মেইল এবং সংযুক্ত স্মারকলিপি কল্পনার কোনো ধরনের ব্যাপ্তিতেই আমার অনুরাগের প্রকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে না। এটাও বলা যেতে পারে না যে, আমি কাশ্মীরে ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক হত্যা করা পাকিস্তানি নাগরিকদের নাম সংগ্রহ করছি। তখনও, ই-মেইলটি কোর্ট কর্তৃক জামিনে আমার মুক্তি অস্বীকার করে আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃত।

৫ সেপ্টেম্বর ২০০২, ভারতীয় সরকারের, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারির (অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা) অধীনে, রাষ্ট্রপতির পক্ষে বি.আর ধিমান কর্তৃক জারিকৃত আদেশে অবৈধতা আর মিথ্যা বর্ণনা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। যেখানে বলা হয়েছে:

যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত সৈয়দ ইফতিখার গিলানি প্রতিরক্ষা এবং অন্যান্য ব্যাপার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিল সংগ্রহে আদান-প্রদানের ষড়যন্ত্রে প্রবেশ করেছে যেগুলো শত্রুর জন্য উপকারী বলে বিবেচিত বা উপকারী হওয়ার মতো বা হতে পারত এবং/অথবা একজন অননুমোদিত ব্যক্তির কাছে যার প্রকাশ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা ও স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

...কেন্দ্রীয় সরকার কথিত অভিযোগ ও মামলার পরিস্থিতির আগে সতর্কভাবে তথ্য ও উপাদান পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হয়েছে যে কথিত ব্যক্তিকে আইনের কোর্টে আনা হবে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট, ১৯২৩ আর/ডব্লিউ আইপিসি এর ১২০ এবং অন্যান্য সমজাতীয় অপরাধের ৩/৯ ধারা মোতাবেক শাস্তির জন্য (জোর দেয়া হবে)...

আদেশের মূল সূত্র মোটামুটি ভুল। আদেশে বলা হয়েছে যে, তথ্য ও দলিলের 'প্রকাশ' রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্য ক্ষতিকর। যেহেতু আমার কাছ থেকে পুনরুদ্ধারকৃত দলিলের তথ্য ইতিমধ্যেই প্রকাশ হয়ে গেছে কাজেই

একই জিনিস 'প্রকাশের' প্রশ্ন এখানে উঠবে না। কেউ কোনো প্রকাশ্য ব্যাপার প্রকাশ করতে পারে না।

কোর্টের উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই এই আদেশ নিউ দিল্লির স্পেশাল সেল পুলিশের ডেপুটি কমিশনার অশোক চন্দকে অনুমোদন করে ওএস অ্যাক্ট ১৯২৩ এর অধীনে একটি অভিযোগ দায়ের করার।

৬ সেপ্টেম্বর ২০০২ ডিসিপি অশোক চন্দ ওএস অ্যাক্টের অধীনে অফিসিয়াল অভিযোগ দায়ের করে।

ডিসিপি অশোক চন্দের দায়ের করা অভিযোগটি স্বয়ং আমার নির্দোষিতার একটি প্রমাণ। 'স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার অস্বীকার: কাশ্মীরে ভারতীয় নিপীড়নের একটি পুনঃমূল্যায়ন' শিরোনামে সংযুক্ত গবেষণা পত্রের প্রকাশিত সংস্করণের ফটোকপির উল্লেখ করে, অভিযোগপত্রের ৮ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'অনুসন্ধানকালে আটককৃত দলিলের সাথে ছয় পৃষ্ঠার দলিলের তুলনা করা হয়েছে এবং মিল পাওয়া গেছে এবং দলিলের তথ্যের সাথে ইফতিখার গিলানির কম্পিউটারে আয়কর কর্মকর্তাদের পাওয়া 'ফোর্সেস' শিরোনামে পাঁচ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান তথ্যের মিল পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে বর্তমান মামলাটি নিবন্ধন করা হয়েছে।'

তিহারে আমার সাত মাসের দীর্ঘ বন্দিত্বকালীন সময়ে আমি অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের বহু শিকার দেখেছি। দিল্লি এবং দিল্লির আশেপাশে ওএস অ্যাক্টের অধীনে মানুষকে আটকের প্রবণতা আতঙ্কজনক হয়ে পড়েছে বিশেষভাবে বিগত তিন বছর অনুপাতে।

আমার গ্রেফতারের সময়, ওএস অ্যাক্টের অধীনে তিহারের বিভিন্ন কারাগারে অন্তত ত্রিশ জনেরও বেশি ব্যক্তি আটক ছিল। সবগুলো মামলা ছিল ১৯৯৯-২০০২ সময়কালীন। আগে ওএস অ্যাক্ট এত ঘন ঘন ব্যাবহৃত হতো না কিন্তু ১৩ ডিসেম্বরের সংসদ আক্রমণের পর থেকে মামলায় সংখ্যায় অস্বাভাবিক বাড় দেখা যাচ্ছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফারনানদেজ লোক সভাকে হতভম্ব করে দিয়েছিলেন যখন তিনি প্রকাশ করেন যে গত তিন বছরে ৪৬ জনের মতো আর্মি ব্যক্তিত্ব এবং সতের জন সাবেক আর্মি ব্যক্তিত্বকে আইএসআই এর সাথে যোগাযোগের জন্য কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে শাস্তিমূলক কার্যক্রম

পরিচালিত হয়েছে তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে; একজন পালিয়ে যাচ্ছিল এবং অন্য চারজনের ব্যাপারে মামলা পুলিশের দ্বারা তদন্ত করা হচ্ছিল।

এক বছর আগে রাজ কুমার নামে একজন কমান্ডার যে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত ছিল, অন্ধ্র প্রদেশের একটি কারাগারে আত্মহত্যা করে। কুমার(৫২) কাজ করছিলেন ইস্টার্ন নেভাল কমান্ডে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে নৌবাহিনীর ঘাটিতে। তাকে গ্রেফতার করা হয় একজন আইএসআই প্রতিনিধি রাজবির সিংয়ের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে। কুমার টয়লেটের লোহার শিকে ঝুলে আত্মহত্যা করে তার জামিন আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর।

সাম্বা গুপ্তচরবৃত্তি মামলা ৭০ এর দশকে পুরো দেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল যখন মিলিটারি ইনটেলিজেন্স ৫২ জন আর্মি ব্যক্তিত্বকে পাকিস্তানের পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য অভিযুক্ত করে। দুই বছর আগে দিল্লি হাই কোর্ট দুজন কর্মকর্তাকে নির্দোষিতার সনদ দেয় যারা কোর্ট মার্শাল কার্যক্রমের পর আর্মির দ্বারা অভিযুক্ত হয়েছিল। যাহোক, সুপ্রিম কোর্ট পরে দিল্লি হাই কোর্টের আদেশ ধরে রাখে সরকার থেকে করা একটি আবেদনের প্রেক্ষিতে এবং শুনানি এখনও শেষ হয়নি।

হুসামউদ্দিন নামে একজন ছুতারমিস্ত্রী দিল্লিতে বাসে চড়ার সময় একজন আইবি কর্মকর্তার সাথে ধ্বস্তাধস্তি করে। তাকে একটি জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রে নেয়া হয় এবং যেসব জায়গায় তাকে বদলি করা হয়েছিল সেসব ইউনিটের ঠিকানা ও নাম লিখতে বলা হয়। হুসামউদ্দিনের সম্প্রতি জামিনে মুক্তি হয়েছে, ছয় বছর কারাগারে থাকার পর। মুহাম্মদ ইশরাক নামে এক কেরানির তার সাথে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। তাদের উভয়কে ১৯৯১ সালে গ্রেফতার করা হয়। মামলাটি এখনও কোর্টে ঝুলে আছে।

একজন এয়ার ফোর্স অফিসার কে.সি সায়নির মামলা একটি মজার পাঠ দেয়। তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল দুটি আলাদা ওএসএ অপরাধে কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে সে দুটোতেই জামিনে মুক্তি পায় যেখানে তার সাথেই অভিযুক্ত ডিফেন্স রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) এর একজন সিপাই, বলরাম, কারাগারে আটক ছিল টি-৭২ ট্যাঙ্কের বিস্তারিত থাকা একটি কম্পিউটার ফ্লপি চুরির অভিযোগে।

সরকারের সংসদকে বলা সত্ত্বেও যে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যে তারা ফ্লপিটি পাকিস্তান হাই কমিশনে প্রতিনিধির কাছে দিতে যাচ্ছিল, বলরামের জামিন সিএমএম এবং সেশন কোর্ট উভয়ের থেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়। কারাগারে এগারো মাস কাটানোর পর বলরাম হাইকোর্ট থেকে জামিন পায়।

সাইনি পূর্বেও সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন কর্তৃক আটক হয়েছিল, যখন এটা দাবি করেছিল যে তারা অব. এয়ার ভাইস মার্শাল জে.এস কুমারের নেতৃত্বাধীন একটি গুপ্তচর চক্রকে ধ্বংস করেছে। কিন্তু বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায় এবং তিন মাস পর সাইনি জামিনে মুক্তি পায়। কিন্তু তিনি আবারও আরেকটি সংস্থা কর্তৃক গুপ্তচরবৃত্তির মামলায় তুলে নেয়া হয়, এবার তুলে নেয় দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল।

সাইনি দাবি করেন যে তার অপরাধ ছিল এয়ার ফোর্সের সরবরাহের কাজ করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নাম তিনি প্রকাশ করেছিলেন যাদের কাছে তিনি বিক্রি করছিলেন এবং তিনি ক্রয় বিভাগে তার সহযোগীদের নামও প্রকাশ করেন।

মুহাম্মদ ইসলাম নামে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন এর একজন অব. চাকুরীজীবীকে গ্রেফতার করা হয় তার উত্তর প্রদেশ, সাহারানপুর জেলার দেওবন্দের নিজ বাসা থেকে জানুয়ারি ২০০২ সালে, দিল্লির দরিয়াগঞ্জ এলাকা থেকে তুলে নেয়া জনৈক হাজি সামিউদ্দিনের প্রকাশিত অভিযোগের ভিত্তিতে। তার কাছে জম্মু ও শ্রীনগরের মাঝে ন্যাশনাল হাইওয়ে নং-১ এ অবস্থিত জাওয়াহার টানেলের ম্যাপ থাকার অভিযোগ আনা হয়। মুহাম্মদ ইসলামের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অনুযায়ী, তার কাছে পাওয়া 'গোপন দলিলটি' ছিল ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এর একটি প্রচারমূলক ছোট পুস্তিকা।

ওয়াসি আখতার জাইদি, উত্তর প্রদেশ পুলিশের লোকাল ইনটেলিজেন্স ইউনিটের একজন কর্মকর্তা, যার ব্যাপারটিও কাণ্ডজ্ঞানহীন ওএস অ্যাক্ট প্রয়োগের একটি উদাহরণ। জাইদি দাবি করেন যে ১৩ সেপ্টেম্বর সংসদ আক্রমণের ঘটনাটিতে একজন আইবি গোয়েন্দা, যার সাথে তার ঝামেলা ছিল, সুযোগ হিসেবে নিয়েছে। তাকে বেআইনিভাবে তুলে নিয়ে লাল দূর্গে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তাকে এক সপ্তাহ অত্যাচার করা হয়। তারা মীরাট ক্যান্টনমেন্টের একটি হাতে আকা ম্যাপ এবং সাবেক আর্মি প্রধান ভি.এম শর্মা স্বাক্ষরিত একটি নিষিদ্ধ

আদেশ তার উপর চাপিয়ে দেয়। জাইদি বলে যে সে কোনোদিন এসব দলিল দেখেনি।

ওএস অ্যাক্টের অধীনে অভিযুক্ত আরেকজন হচ্ছে মুহাম্মদ আসলাম যে একজন অটোরিকশা চালক। পুলিশ তাকে বর্ণনা করেছে একজন 'ক্ষুদ্র চোরাচালানি' হিসেবে। তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছে দিল্লি ও আগ্রা ক্যান্টনমেন্টের স্কেচ পার করা এবং মীরাট ও রোরকিতে অবস্থিত ইউনিটের বিস্তারিত পার করা আর দিল্লি সেক্রেটারিয়েট, ওকলা ব্যারেজ ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন এর মতো 'গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার' কিছু শখের ছবি পার করার জন্য।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর রিতু সারিন দিল্লির বিভিন্ন কোর্টে ওএস অ্যাক্টের অধীনে ঝুলে থাকা মামলার ধরন নিয়ে তদন্ত চালান। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ ৯ মার্চ ২০০৩-১২ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত প্রকাশিত তার চার পর্বের প্রতিবেদনটি চোখ খুলে দেয়া। সারিন লিখেন, 'মীরাট হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে স্পর্শকাতর জায়গা। শেষ বছরে বা এরকম সময়ে, ওএসএ পর্যবেক্ষকরা পুলিশ ফাইলগুলোতে এক অদ্ভূত ব্যাপার খেয়াল করেছেন। প্রায় ছয়টির মতো মামলায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আর্মি ক্যান্টনমেন্টের হাতে আকা স্কেচ প্রমাণ হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। এবং তিনটি মামলায় মীরাট ক্যান্টনমেন্টের প্রায় একই রকম স্কেচ দেখানো হয়েছে এবং চতুর্থ মামলায় আবারও মীরাটের ইউনিট ফর্মেশন। কিছু আইনজীবী এসব স্কেচ কপি করেছেন প্রমাণের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের জন্য।'

আজকের দুনিয়ায় যেখানে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত ম্যাপ সহজলভ্য, কোনো দেশের জন্য কিছু অনভিজ্ঞ লোকের যারা টুরিস্ট ম্যাপের চেয়ে কম বিস্তারিত দিয়ে কিছু এলাকার স্কেচ শুধু স্কেলে আকতে পারে এমন কাজ ব্যাবহার করা অদ্ভূত শোনায় না?

এমনকি ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন (আইএসআরও) এর এস. নাম্বিনারায়ণের মতো একজন সিনিয়র বিজ্ঞানি কারাবন্দিত্ব এবং মানসিক অত্যাচার ভোগ করেছেন ওএস অ্যাক্টের অপব্যবহার এবং অজ্ঞ প্রয়োগের কারণে। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন কেরালা সরকারকে আদেশ করেছে তাকে এক মিলিয়ন রুপি ক্ষতিপূরণ দিতে তার মানবাধিকার পদদলিত করার জন্য।

অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের উপর অনুসন্ধানমূলক সিরিজের সংক্ষিপ্ত করে, ১২ মার্চ ২০০৩, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এ সম্পাদকীয়তে বলা হয় যে, 'এই আইনের অধীনে অদ্ভূত গ্রেফতার ভারতীয় গণতন্ত্রের সুনাম নয়।' সম্পাদকীয়তে বলা হয় 'এই তথ্যের যুগে অফিসিয়াল সিক্রেট অ্যাক্টের অস্তিত্ব রাখার কোনো ছুতা নেই। যে সরকার তথ্য আইনের স্বাধীনতাকে তৈরী করেছে এবং ইফতিখার গিলানির আটকের ব্যাপারে এর অপব্যবহার স্বীকার করেছে, এখন তার অবশ্যই একটি কোর্স কারেকশন করা উচিত।'

সরকারের এই কোর্স কারেকশনের অপেক্ষায় আছে দেশের সকল বিবেকবান নাগরিক।

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বই সমূহ

নন-ফিকশন

ক্র	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
০১	কয়েদী ৩৪৫	সামি আলহায়	২৩৫৳
০২	আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম	টিম প্রজন্ম	২২০৳
০৩	গুজরাট ফাইলস	রানা আইয়ুব	৩০০৳
০৪	দ্য কিলিং অব ওসামা	সিমর হার্শ	২১৬ট
০৫	উইঘুরের কান্না	মুহসিন আবদুল্লাহ	২৬৪৳
০৬	আজাদীর লড়াই (কাশ্মীর কেস ফর ফ্রিডম)	অরুন্ধতী রায়	২০৪৳
০৭	আয়না	আফজাল	৩২০৳
০৮	জাতীয়তাবাদ	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৫০৳
০৯	দ্য রোড টু আল-কায়েদা	মুনতাসির আল-যায়াত	৩৩০৳
১০	মোস্ট ওয়ান্টেড উইম্যান	দাউদ গজনভী	৩০০৳
১১	ভারতে সন্ত্রাসবাদের আসল চেহারা	এস এম মুশরিফ	৫০০৳
১২	একটি ফাঁসির জন্য	অরুন্ধতী রায়	৩০০৳
১৩	নয়া পাকিস্তান	তীলক দেভাশের	৩২০৳
১৪	মোসাদ এক্সোডাস	গ্যাড সিমরণ	২৫০৳
১৫	পার্মানেন্ট রেকর্ড	এডওয়ার্ড স্নোডেন	৩৫০৳
১৬	অ্যাম্বাসেডর	আবদুস সালাম জাইফ	২৩৫৳
১৭	মুখোশের অন্তরালে	নাজমুল চৌধুরী	৩০০৳
১৮	ম্যালকম এক্স । নির্বাচিত ভাষণ	ম্যালকম এক্স	৪০০৳
১৯	মাইন্ড ওয়ারস	ম্যারি ডি জোনস	৩৩০৳
২০	বিপ্লবী ভাষণ । বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব	আহমদ মুসা	৩৫০৳
২১	নির্বাচিত বাণী	শেখ মুজিবুর রহমান	২০০৳
২২	মৌলবাদী নাস্তিক	কাজী ম্যাক	২৮০৳
২৩	বীর নারী মুক্তিযোদ্ধার কথা	সুরমা জাহিদ	২০০৳
২৪	পুঁজিবাদ	অরুন্ধতী রায়	১৭৫৳
২৫	যে কারণে শেখ মুজিবকে ভালোবাসি	রফিকুল ইসলাম	২০০৳
২৬	ইলুমিনাতি এজেন্ডা	ডিন এন্ড জিল হ্যান্ডারসন	২৫০৳
২৭	ওসামার সাথে আমার জীবন	নাসের আল-বাহরি	৩৩০৳
২৮	শত্রুযোদ্ধা	মোয়াজ্জেম বেগ	৫৫০৳

স্কিল ডেভেলেপমেন্ট

ক্র	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
০১	না বলতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
০২	এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু সে	ফিল. এম জোনস	২০০৳
০৩	এটিটিউড ইজ এভরিথিং	জেগ কেলার	৩০০৳
০৪	বেঁচে থাকতে শিখুন	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
০৫	সফল উদ্যোক্তা	সুব্রত বাগচী	৪০০৳
০৬	ছোট অভ্যাস বড় সাফল্য	জেফ কেল্লার	৩৫০৳
০৭	সুখী ও সুন্দর জীবনের ফরমুলা	নিক ভুইয়িচিচ	৪৫০৳
০৮	এক্স্যাক্টলি হোয়াট টু স্টার্ট	ফিল. এম জোনস	২৮০৳
০৯	লেখালেখির ১০১টি অনুশীলন	মেলিসা ডোনাভান	৩০০৳

ফিকশন

ক্র	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
০১	মানুষ যেখানে যায় না	মইনুল আহসান সাবের	২০০৳
০২	ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ	ক্যারিন স্লটার	১৮০৳
০৩	মার্ডার ইন এ মিনিট	সৌভিক ভট্টাচার্য	৩০০৳
০৪	গুজবাম্পস	আর এল স্টাইন	২০০৳
০৫	সবারই গল্প আছে	ওয়াহিদ তুষার	৩০০৳
০৬	পিচ্চি রতন ও ফুটবল	আমিরুল ইসলাম	২০০৳
০৭	কেষ্ট কবির কষ্টগুলো	ইসমোনাক	১৫০৳
০৮	কেষ্ট কবির কনফারেন্স	ইসমোনাক	১৫০৳
০৯	কেষ্ট কবি	ইসমোনাক	১৫০৳
১০	ইন এনিমি হ্যান্ডস	মনু ধওয়ান	১০০৳
১১	নীহার নিয়তি	সামছুন্নাহার বেগম	২০০৳
১২	পলিটিক্যাল জোকস	আহমদ মুসা	২০০৳
১৩	কালার অব প্যাশন	সৌরভ মুখার্জী	২৫০৳
১৪	দ্য আন প্রোডিগাল	মৈনাক ধর	২৫০৳

যে বেদনাদায়ক গল্প এ বইতে রয়েছে তা শুধু ক্ষমতার খামখেয়ালিপনা আর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ নয়, নয় ভারতীয় রাষ্ট্রের নিছক অনৈতিকতার ভয়ঙ্কর উপাখ্যান। কীভাবে সমাজের তথাকথিত স্তম্ভগুলো—চতুর্থ স্তম্ভের সাথে একজোট হয়ে সুস্পষ্ট অবিচার নিয়ে আসে তার একটি হতাশাজনক চিত্র।

ইফতিখারের মতো একজন নম্র ভদ্র মানুষকে অনেক কষ্ট এবং অপমান সহ্য করতে হয়েছে এবং তার অক্ষত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে চরম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। তিনি তার গল্প সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে এখানে বলেছেন যা সাংবাদিক হিসেবে তার নৈপুণ্যের পরিচয় বহন করে। এখানে প্রচুর করুণ ও নোংরা হাস্যরস রয়েছে। ইফতিখার সাংবাদিক হিসেবে তার দক্ষতা দিয়ে তার নিজের মামলার তাৎপর্য ও বিশেষত্বকে ছাড়িয়ে গেছেন আর আমাদের নিয়মের শিকারদের দুর্দশাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। যে গল্প তিনি এখানে বলেছেন তা শুধু তার নিজের গল্প নয়, সেসব দুর্ভাগাদেরও গল্প যারা ওএসএ এর অধীনে যেন তাসের মামলায় আটকে আছে। তাদের গল্প, যাদেরকে আমাদের কারাগারে অত্যাচার করা হয়েছে, মারা হয়েছে। তাদের গল্প, যারা কারাগারের ধর্ষকামী কর্মকর্তাদের অমানবিকতার স্বীকার।

সিদ্ধার্থ ভরদ্বাজ
The Wire পত্রিকার সম্পাদক